বিজ্ঞান ও সমাজ বিষয়ক দ্বিমাসিক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

• বিকল্পের সন্ধানে •

ভিটনার গ্রামের নারী পঞ্চায়েত
বলিরাজা বাঁধ ও গণউদ্যোগ
কামানি টিউবস্ ও রুগ্ন শিল্প
এইডস—বৈষম্য ও নিপীড়ন
নর্মদা—দুটি লেখা
ক্যান্সারের রাজনীতি, এছাড়া
কোলাঘাট, বীরভূম রিপোর্ট

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত ——— চতুর্দশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা ——— সেপ্টেঃ-অক্টোঃ 1990 ——— দাম দু টাকা

যা থাকছে এই সংখ্যায় সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1990 ▫ চতুর্দশ বর্ষ ▫ দ্বিতীয় সংখ্যা

- বি ও বি-র কথা
- নারীর সাধিকার—ভিটনার গ্রামের কথা
  পঞ্চায়েত পরিচালনার ভার নিলেন গ্রামের নারীরা / 3
- বলিরাজা বাঁধ : প্রগতির বিকল্প ধারা ?
  প্রশাসন নয়, ঠিকাদার নয়, সাধারণ মানুষ গড়ছেন নিজেদের বাঁধ / 5
- কামানি টিউবস্ : বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলায় একটি পদক্ষেপ
  শ্রমিক সমবায়ের মালিকানায় উৎপাদন শুরু বন্ধ কারখানায় / 13
- 'একটি গাছ একটি প্রাণ' - কোলাঘাটে গণ আন্দোলন
  গাছকাটা রুখতে গিয়ে মার খেলেন বিজ্ঞানকর্মী / 16
- এইড্স : তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও সরকারী ভূমিকা
  ভুল তথ্য, দমনমূলক আইন, লাঞ্ছনা—অন্ধকার জগতে আন্দোলনের আলো / 17
- 'সংঘর্ষ যাত্রা' - নর্মদাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন
  আদিবাসী, দলিত, আক্রান্ত মানুষের পথহাঁটা—'উন্নয়ণের' হাতে বিপন্ন মানুষের মুখ ভেসে ওঠে পর্দায় / 24
- নর্মদা প্রকল্পকে ঘিরে মধ্যপ্রদেশের মানুষের কাছে একটি আবেদন : বাবা আমতে / 26
- আন্ত্রিক মহামারী—1990 : বীরভূমের রিপোর্ট
  প্রতি বছর আন্ত্রিক আসে—গত বর্ষায় গ্রামের মানুষ রুখে দাঁড়ালেন তার বিরুদ্ধে / 31
- ক্যানসারের রাজনীতি
  ধূমপান ক্ষতিকর—কিন্তু বড় বিপদ রাসায়নিক কারখানা—আমেরিকার অভিজ্ঞতা / 32

বি ও বি-র কথা

কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় উঠেছিল এক ছোট্ট খবর। প্রচুর মার খেয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় হাতপাতালে ভর্তি হয়েছেন কোলাঘাটের এক যুবক। বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যুক্ত ওই যুবকের অপরাধ হল তিনি ঠিকাদারদের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন একটি গাছের জীবন। আজকের পটভূমিকায় খবরটি অবশ্যই ইঙ্গিত দিচ্ছে, এক অশুভ সময়ের। কে বলতে পারে আগামী দিনে হয়ত আমরা দেখা পাব পরিবেশ-অপরাধকে সংগঠিত রূপ দিচ্ছে এমন সব পরিবেশ-মাফিয়াদের। যার চেহারা জঙ্গল কাটার জগতে এখনই স্পষ্ট।

শহর কোলাঘাট পরিবেশ-অপরাধের জন্য এর আগেই খবরের কাগজে নিজের নাম তুলেছে। বিষয়—কোলাঘাট তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ছাই উড়ে এসে পড়ছে জনপদে। একই অপরাধের বিরুদ্ধে সম্প্রতি সোচ্চার হয়েছেন শহর কল্যাণীর মানুষরা। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত হল ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

পরিবেশ দূষণ শুধু যে ঘটছে স্থানীয় কারণে তা বললে ভুল করা হবে। কখনও কখনও তা মানে না দেশ-বিদেশের ব্যবধান। -পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্র এখন শান্ত, অথচ যুদ্ধের ফলে যে বিশাল পরিমাণ সাধারণ ধূলিকণা থেকে শুরু করে মারাত্মক সব ক্যান্সারসৃষ্টক ছড়িয়ে পড়েছে পরিবেশে তা আমাদের যন্ত্রণা দেবে বহু সময় ধরে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তেলের খনি জ্বলছে এখনও। এর ছাই বেশ কিছু অঞ্চলে এমন কি সূর্যের আলোকেও প্রায় দিয়েছে নিভিয়ে। শোনা যাচ্ছে কাশ্মীরের তুষারেও নোংরা তেল আসছে আরব দুনিয়া থেকে। তুষার শুভ্রতায় ছাপ পড়ছে হিংস্র যুদ্ধবাজদের কালো থাবার।

এরবের মধ্যেই আবার কলকাতায় বাড়ী ভেঙে পড়েছে। ইঞ্জিনীয়ার ও আর্কিটেক্টরা এ ব্যাপারে তাঁদের অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। বাড়ী ভেঙে পড়া আজ নগরায়ন সমস্যার মূলে আঘাত করেছে। দেখা যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের সব বড় শহরেই কতগুলো একই ধরণের বড় মাপের সমস্যা তৈরী হচ্ছে। গরীব লোকদের থাকার জায়গাগুলো ঘিঞ্জি, নর্দমাহীন, পানীয় জলহীন এক নরক। পাশাপাশি ধনীরা চলে যাচ্ছে শহরতলীতে। পরিবেশ-দূষণ যেমন গণবিজ্ঞান আন্দোলনের এক প্রধান বিষয়, নগরায়ণ কিন্তু এখনও ততটা আমাদের মনোযোগের আওতায় এসে পড়েনি। অল্প জায়গায় অসংখ্য লোকের থাকার ফলে মানসিক চাপ, অপরাধী হয়ে ওঠা ইত্যাদি সামাজিক দূষণের বড় নির্ণায়ক। অবহেলিত এই বিষয়টি আগামী দিনে গণবিজ্ঞান আন্দোলনে জায়গা করে নেবে এই বিশ্বাস।

* * * * *

গত ২৩শে মার্চ অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান কর্মী সংস্থার বার্ষিক অধিবেশন। বিদ্যুৎ ছিল না। তাই স্বল্প আলোকে পাখা ছাড়াই আলোচনা চালাতে হল। আলোচিত বিষয়গুলির একটি ছিল সংস্থার মুখপত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কর্মীর প্রকাশকে ঘিরে নানান সমস্যার কথা। ঠিক হল পত্রিকাকে ঘিরে আরও কথা বলা ও শোনা হবে আগামীতে, দিন ঠিক করে।

আর এই সব কিছুর মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর 1990 সংখ্যাটি সময়ের তুলনায় অনেক পিছনেই। তবে ব্যবধান কমছে এটাই আশার কথা।

* * * * *

দেশের নানান অঞ্চলে ছোট বড় তাৎপর্যপূর্ণ সব সামাজিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে উন্নয়ন, উৎপাদন, সমাজ তথা ব্যক্তি জীবনকে কেন্দ্র করে। শুধু সমালোচনা নয় বিকল্প পরিকল্পনা তথা কর্মপদ্ধতিও দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও। পাশাপাশি অল্প জানা, ভুল ধারণায় ঢাকা এমন সব বিষয় উঠে আসছে আমাদের বিজ্ঞান তথা স্বাস্থ্য জগতের মধ্যে যারা দাবী করে গণবিজ্ঞান-গণস্বাস্থ্যর জগতে সচেতনতা বাড়ানোর এক জরুরী প্রয়াস।

নানান অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরের মিলিত যে আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি তা এই কথাই বলছে যে মানুষ ভাষা পাচ্ছে, মানুষ সৃষ্টি করছে, মানুষ দাবী করছে।

গণবিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এদের যাচাই করে নেওয়ার এক পদ্ধতি প্রকরণে আমরা আগ্রহী।

এবারের সংখ্যায় সে চেষ্টাই আমরা করছি।

ঐক্যের প্রদর্শনী

আমাদের পুরুষ, নারী এবং শিশুরা; হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শিরা... ভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, কিংবা উত্তর থেকে—হাজার হাজার লোক এসে অংশ গ্রহণ করেন প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে।
তার মধ্যে দিয়ে আবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের ঐক্যের ভবিষ্যাটি।
আর তারা জাতি, ধর্ম, অঞ্চল এবং ভাষার বাধাকে দূর করে দেবার অঙ্গীকার গ্রহণ করে আমাদের লক্ষ লক্ষ জনগণের মঙ্গলের জন্যে কাজ করতে জাতিকে শক্তি জোগায়।

উৎসবের এই ভাবদাটি জাগিয়ে রাখুন।
আসুন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা এগিয়ে যাই।

davp 90/753 BEN.

নারীর স্বাধিকার—ভিটনার গ্রামের কথা

[1986 সালের নভেম্বর মাসে শক্তিশালী এক কৃষক-সংগঠন 'শেতকারি সংগঠনা'র ডাকে এক লাখেরও বেশী কৃষক পরিবারের মহিলারা জড়ো হন মহারাষ্ট্রের চাঁদওয়াড়ে। শেতকারি সংগঠনার সহযোগী নারী সংগঠন 'শেতকারি মহিলা আগাড়ি'র পক্ষ থেকে কৃষিজীবি নারীদের বহু মতামত, পরামর্শকে ভিত্তি করে সম্মেলন প্রকাশ করে একটি ঘোষণা, নাম—সিদোরি।

1979-80 সালে কৃষকরা মহারাষ্ট্রে শেতকারি সংগঠনায় জড়ো হয়েছিলেন একটিই দাবী (কৃষি-পণ্যের নায্য দাম দিতে হবে) নিয়ে। বলা হচ্ছিল গ্রাম 'ভারত'কে (শহরের উদ্বাস্তুদের সমেত) শহর-ভিত্তিক 'ইণ্ডিয়া' দিয়ে লুঠ করার কথা। 1986 সালে নারী সংগঠনের উঠে আসার সাথে সাথে এই আন্দোলন আরও জোরালো ও গভীর হয় নারী অধিকারের প্রশ্নকে তুলে ধরে। 1987 সালে শেতকারি মহিলা আগাড়ি, স্ত্রী মুক্তি সংঘর্ষ ও অন্যান্যরা মিলে তৈরী করে 'সমগ্র মহিলা আগাড়ি'। দাবী করা হয় নারীদের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলিকে তুলে ধরতে হবে বিকল্প উন্নয়নের দিকে জোর দিয়ে। একদিকে লড়তে হবে নিরাপত্তাহীনতা আর গ্রামের ক্ষমতাভিত্তিক গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে। অন্যদিকে চাই পানীয় জলের সুব্যবস্থা, চাই পরিষ্কার পায়খানা ও স্নানের জায়গা, চাই সস্তা বিকল্প শক্তি। অর্থহীন সরকারি পাথর ভাঙার বদলে চাই গ্রামের উপকারে লাগে এমন কাজ। চাই টাকা ঢেলে পাওয়া চিকিৎসার বদলে নিজেদের পায়ে দাঁড়ান এক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা··· ।

হ্যাঁ, কি ভাবে যেন আমরা এসে পড়েছি গণবিজ্ঞান প্রয়াসের আঙিনায়। মনে হচ্ছে হয়ত বা নারীর স্বাধিকার ও গণবিজ্ঞানের সম্পর্ক নানান রঙিন সুতোয় বোনা এক উজ্জ্বল নকশার দুই রং।

আর এখান থেকেই শুরু ভিটনার গ্রামের গল্প। —স. ম.]

মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলায় চোপড়া তালুকের অন্তর্গত, সোপি নদীর তীরের একটি ছোট্ট গ্রাম ভিটনার। বর্ষার চারমাস গ্রামটি বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই এই কয়মাসের খাদ্য সামগ্রী গ্রামবাসীদের মজুত করে রাখতে হয়—এমনই গণ্ডগ্রাম ভিটনার।

1989 সালে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে গ্রামটিতে। এক—গ্রামপঞ্চায়েতের সব কটি আসনে মেয়েদের নির্বাচিত হওয়া এবং দুই—স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশীদার হওয়া।

কিন্তু ব্যাপারটি খুব সহজে ঘটে যায় নি। মহারাষ্ট্রের কৃষক নারী আন্দোলনের কয়েক বছরের প্রচেষ্টা ছিল এর পিছনে। শেতকারি মহিলা সংগঠনের চাঁদোয়াড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় 1986 সালের নভেম্বর মাসে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সম্পত্তিতে মেয়েদের সমঅধিকার থাকা উচিৎ। আরেকটি প্রস্তাব নেওয়া হয় যে মেয়েদের পঞ্চায়েতের উপর অধিকার রাখতে হবে। সেই মুহূর্তে সম্পত্তির অধিকারের সিদ্ধান্তটি নিয়ে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি যদিও পরবর্তী অনেকগুলি সম্মেলনে তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। এইসব আলোচনায় বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসে এবং তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা হয়।

সাধারণ ভাবে যে আপত্তির কথা বলা হয়, তা হল মেয়েদের বিয়েতে পণ দিতে হয় কাজেই আবার সম্পত্তির ভাগের বিষয় ওঠা উচিত নয়। এর জবাবে বলা হল—পণ হিসাবে মেয়েরা যে সম্পত্তি পায় যেমন নগদ টাকা বা গহনা, তার সঙ্গে ছেলেরা যে সম্পত্তি পায়—যেমন জমি, পৈতৃক ব্যবসা প্রভৃতির কোন তুলনা হয় না। ছেলেদের প্রাপ্য সম্পত্তি পরিবারের জীবিকা-নির্বাহের কাজে সহায়ক। কিন্তু মেয়েরা যা পায় পণ হিসাবে তা দিয়ে তাদের কোন আয় হয় না এবং এগুলি বেশীদিন তাদের অধিকারেও থাকে না। এই সম্পত্তির মূল্যমান তাই একই থেকে যায় এবং কখনও কখনও তা কমতেও থাকে। আরেকটি আপত্তি তোলা হয় যে, মেয়েরা যদি জমির ভাগ পায় তাহলে জমি ক্রমশ টুকরো হতে হতে এক সময়ে আর ফসল দেবে না। এর জবাবে বলা হল, এ ধরনের ঘটনা ছেলেদের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। জমি টুকরো হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ কিন্তু উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য নয়—তা হয় মূলত জমির উপরে জীবিকা নির্ভরতার অত্যধিক চাপ থাকার জন্য। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান কৃষির উপর নির্ভরশীলতা কমানো। মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। আরেকটি অবান্তর যুক্তি দেখানো হলো যে কৃষি এখন আর মোটেই লাভজনক নয়। এবং মেয়েদের জমিতে ভাগ দিতে গেলে লোকসান আরও বাড়বে। মহিলা কর্মীরা এর উত্তরে বললেন—বিপুল পরিমাণ মহিলা শ্রমিককে আজ খেতের কাজে লাগানো হচ্ছে। দায়িত্ব যখন এইভাবে ভাগ হতে পারে তখন কৃষি জমি কেন ভাগ হবে না? এবং কেনই বা লোকসানও ভাগ করা হবে না। 1989 সালের নভেম্বরে 'অমরাবতী সম্মেলনে' ঠিক হয়েছিল পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার গ্রহণের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা হবে।—এই রকম একটি আদর্শ গ্রামের প্রথম উদাহরণ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল ভিটনার। 2রা জানুয়ারী 1990 মহারাষ্ট্রের দলিতদের পক্ষে লড়েছেন এমন এক সমাজ সংস্কারক জ্যোতিবা ফুলের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর জন্মস্থান কাটগুণ গ্রাম থেকে একটি বিচার যাত্রা শুরু হয়ে নাগপুরে

একটি জনসভায় এসে শেষ হয়। এই জনসভায় ভিটনারকে জ্যোতিবা ফুলের নামে 'জ্যোতিবা গ্রাম' বলে অভিহিত করে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ভিটনার গ্রামে 200টি পরিবার আছে। 10 থেকে 15টি পরিবারের 15 একর বা তার বেশী জমি আছে। শতকরা 75 জনের পাঁচ একর করে জমি আছে। শতকরা 10 থেকে 15 জন ভূমিহীন। একজন পুরুষ কৃষি শ্রমিক দৈনিক পান 15 টাকা মজুরী এবং একজন মহিলা কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরী 8 টাকা। একজন শ্রমিক দিনে 6 ঘণ্টা কাজ করেন। স্থায়ী শ্রমিকরা যারা প্রত্যেকেই পুরুষ বছরে 5 হাজার টাকা, 3 কুইন্ট্যাল জনার ভুট্টা এবং এক প্রস্থ জামাকাপড় পায়। এই অঞ্চলের প্রধান শস্য ভুট্টা, জনার, তুলা এবং কলা। কোন কোন পরিবার বাদামও চাষ করে।

গ্রামের প্রধান অধিবাসী মারাঠা, গুজর, কোলি এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ। পণপ্রথার চল মারাঠা এবং গুজর বর্ণের মধ্যে বেশী দেখা যায় কিন্তু কোলি বা পিছিয়ে পড়া বর্ণে এর দৃষ্টান্ত কম।

1989 সালের জুলাইতে ভিটনার গ্রামের পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়। শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মহিলাদের একটি পুরো তালিকা নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু এই চেষ্টা সফল হয় নি। শিবসেনার মদতে মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিলাদের পুরো তালিকাটিই নির্বাচিত হয় এবং সব বিরুদ্ধ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

পঞ্চায়েতের আয় আসে বাড়ীর কর, জল কর এবং চারণভূমি থেকে ভিটনারের চারণভূমি খুবই উন্নত। প্রতিবছর পঞ্চায়েত থেকে নিলাম ডেকে এই চারণভূমি মেষপালকদের দেওয়া হয়। মেষপালকেরা আট মাসের জন্য এই ভূমিতে পশুচারণ করতে পারে। এখান থেকে পঞ্চায়েতের আয় হয় 2500 থেকে 3000 টাকা।

পঞ্চায়েত সদস্যরা প্রতি 15 দিনে একদিন মিলিত হন। গত একবছরে ভিটনারের মহিলা পঞ্চায়েত গ্রামের সবার জন্য এবং বিশেষ করে নারীদের জন্য পায়খানা ও স্নানের জায়গা বানিয়েছে, স্কুলে ছেলেমেয়েদের জন্য খেলার মাঠ তৈরী করেছে। গ্রামের স্কুলে দুজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সব থেকে বড় কাজ হয়েছে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে। কুয়োর সাথে সংযুক্ত নলের সাহায্যে গ্রামবাসীরা এখন পানীয় জল পাচ্ছেন। এই জল 15 অশ্বক্ষমতার একটি মোটরের সাহায্যে কুয়ো থেকে তোলা হয়।

পঞ্চায়েতের একটি মাত্র মোটর ছিল। সেটি খারাপ হয়ে গেলেই সারিয়ে আনার জন্যে জলগাঁও পাঠাতে হত। এবং প্রায় পনেরদিন পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে হত। এই সময়ে মেয়েদের দূরবর্তী কুয়ো থেকে জল আনতে যেতে হতো। এই বছর পঞ্চায়েত 15000 টাকা দিয়ে আরও একটি মোটর কিনেছে। একটি অকেজো হলে দ্বিতীয়টি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এই মোটর কেনার পয়সা এসেছে চারণভূমি অঞ্চলের কিছু গাছ বিক্রী করে।

গ্রামের অধিবাসী মহিলা পুরুষদের প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মহিলা পঞ্চায়েতের অধীনে এসে তারা কি কি পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।

মহিলারা বলেন পানীয় জলের সমস্যাটির সমাধান হয়েছে এবং এর আগে কোন পঞ্চায়েত এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখায় নি। পুরুষেরা এই কথা শুনে হেসে বললেন "আমরা পুরুষেরা কখনও পানীয় জল দূরের কুয়ো থেকে আনার কষ্ট স্বীকার করিনি। কাজেই আগের কোন পঞ্চায়েতই পানীয় জলের ব্যাপারে অর্থ ব্যয় করার কথা ভাবতে পারে নি। মহিলাদের এই সমস্যা ভোগ করতে হত কাজেই তারা এটা সমাধানের চেষ্টা করেছেন।" এই আলোচনাতে প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যরাও ছিলেন। তাঁরাও এ বিষয়ে একমত হন।

মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশ্ন করা হয় যে এই নির্বাচন তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন পরিবর্তন এনেছে কি না। একজন বলেন "আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কী আর পরিবর্তন আসবে? আমরা আগে যে কাজ করতাম এখনও তাই করি। এমনকি যিনি 'সরপঞ্চ' তাঁকেও জ্বালানী সংগ্রহ করতে যেতে হয়। আমাদের ভাগ্যে লেখা আছে কঠোর শ্রম। তোমরা কোন পুরুষ সরপঞ্চকে ভাবতে পারো যে মাঠে কাজ করবে? আমাদের ঘরে এবং বাইরে সমান কাজ করতে হয়।" অবশ্য তিনি বললেন "পরিবর্তন এসেছে অন্য ভাবে। এখন আমাদের সবাই মানে। এমন কি আমাদের পরিবারেও আমাদের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। তালুক অফিসে এখন আমরা গেলে সবাই খুব সম্মান দেয়।" সরপঞ্চ শুভাবাই রাইসিং-এর স্বামী আগে খুব মদ খেয়ে স্ত্রীকে বেদম পেটাতো। এখন সে মদ ছেড়েছে—স্ত্রীর গায়েও হাত তোলে না।

ইন্দিরা বাই বলেছেন "নির্বাচিত হওয়ার পর আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে। আমরা বুঝেছি যে আমরা মেয়েরা সুযোগ পেলেই ভাল কাজ করতে পারি।" নির্বাচন জেতার পর স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অংশীদার হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। চাষী পরিবারে এরকম একটা রীতি বরাবরই ছিল যে একটি করে ছাগল পরিবারের মহিলারা পাবেন। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা বললেন যেহেতু মহিলারা পরিবারের জন্য সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করে তাই সম্পত্তির বড় ভাগটি তাদেরই পাওয়া উচিত। এর বিরুদ্ধে সত্যিই বেশী কিছু বলার ছিল না তবু কিছু বিতর্ক চলল।—অবশেষে গ্রামবাসীরা মহিলাদের যুক্তি মেনে নিলেন। জানুয়ারী 1990-তে 125 জন মহিলা সরকারীভাবে তাঁদের স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেলেন। এই মহিলাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এই ব্যবস্থা তাঁদের জীবনে কি পরিবর্তন এনেছে। তাঁরা বললেন যে এই ব্যবস্থায় স্বামীর পরিবার এবং পৈতৃক পরিবারে তাঁদের মূল্য বেড়েছে। তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে। 1990-এর মে মাসে ভিটনারে মহিলা আগাড়ি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে মহিলাদের মধ্যে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। সম্মেলন শেষে একজন মহিলা সবাইকে লেবুর রস পরিবেশন করতে করতে বললেন "এ লেবু সব আমার জমির গাছের!"

(এই লেখাটি চেতনা গালার—মানুষী—59 সংখ্যা 1990-এ প্রকাশিত 'ট্রাইং টু গিভ উওমেন দেয়ার ডিউ: দ্য ষ্টোরি অফ ভিটনার ভিলেজ' লেখাটির সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ) —পর্মিলা

বলিরাজা বাঁধ ঃ প্রগতির বিকল্প ধারা ?

1. মুখবন্ধ

মহারাষ্ট্রের সাঙলি জেলায় খানাপুর তালুকে, ইয়েরালা নদীর ওপর, তৈরী হয়েছে বলিরাজা বাঁধ। এই বাঁধ গড়ে উঠেছে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনে, চেষ্টায়, পরিকল্পনায় ও শ্রমে। সংগঠিত গ্রামবাসীদের এই প্রচেষ্টা মুখোমুখি হয়েছিলো অজস্র সরকারী বাধার। শুরু হয়েছিলো আন্দোলন। শেষে বহু বাধা পেরিয়ে 5 মার্চ 1989, ইয়েরালার বুকে গড়ে ওঠা বলিরাজা বাঁধের প্রথম জলপথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে যায়।

নদীর বুকে বাঁধ নির্মাণ তো সরকারের কাজ! তবে কেন কয়েক হাজার গ্রামবাসী তাঁদের 'নিজেদের বাঁধ' তৈরী করতে গেলেন? কীভাবে এ কাজ সম্ভব হোলো? মাটির কাছের মানুষদের এই সংঘবদ্ধ সফল প্রয়াস কতটা তাৎপর্যপূর্ণ? নর্মদা-টেহরী ভোপাল-বালিয়াপাল-এর দেশে বলিরাজা বাঁধের কতটুকু মূল্য? প্রগতি পরিকল্পনার বিকল্প রাস্তায়, এই বলিরাজা বাঁধ কি এক ঐতিহাসিক না ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা?

এই সংকলন প্রবন্ধ এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্নের আঙিনায় প্রবেশ করার প্রয়াস মাত্র।

2. অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

2.1. **ভৌগোলিক অবস্থান ঃ** খানাপুর তালুক, দক্ষিণ-পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাঙলি জেলার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এবং স্বাধীনতার আগে সাতারা জেলার অংশ ছিলো। আর ইয়েরালা নদী সোলকনাথ পাহাড় থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে 75 মাইল প্রবাহিত হয়ে কৃষ্ণা নদীতে এসে পড়েছে।

2.2. **সমাজের চিত্র :** এই অঞ্চলের 50% মানুষ মারাঠা-কুনবি গোষ্ঠীভুক্ত। শিবাজীর আমলে মারাঠা সৈন্যের এক বড় অংশ আসতো এখান থেকে। তিরিশের দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-মারাঠা ভূস্বামীরাই এ অঞ্চলে প্রভাবশালী ছিলো। কিন্তু জ্যোতিবা ফুলে-র আন্দোলন, '42-এর 'প্রতি সরকার (প্যারালাল গভর্ণমেণ্ট) আন্দোলন' আর নানান ছোটো বড় কৃষক বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাবে এখানকার বড় জমির মালিকদের সংখ্যা কমতে থাকে। বাঁধ এলাকার বালাওয়াড়ি ও তেণ্ডুলওয়াড়ি গ্রামে মোট ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা চার। অন্যদিকে 10 একরের বেশি জমি কোনো পরিবারেরই নেই। বেশির ভাগ পরিবার 3 থেকে 4 একর জমির মালিক।

2.3. **অতীতের জল ও কৃষির চিত্র :** 1963 সালের 'সাতারা ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার' অনুযায়ী ইয়েরালা নদীতে সারা বছর জল থাকত এবং আশেপাশের জমিতে খুব ভালো পরিমানে আখ, বাদাম, গম, আলু এবং পেঁয়াজ উৎপন্ন হত। পুরোনো আমলের গ্রামবাসীরা বলেন যে ইয়েরালা নদী পারাপার করতে ডিঙ্গি ভাসাতে হতো।

2.4. **গ্রাম থেকে শহর ঃ** '70 দশকের মাঝামাঝি থেকে এই তালুকের কৃষিজীবিরা বেশী সংখ্যায় বোম্বাই যেতে থাকেন স্থতোকল-শ্রমিকের কাজ করতে। ইয়েরালা নদীতে '70-'71 পর্যন্ত বছরের ছ' মাস জল থাকতোই। কিন্তু '81 সালের পর বর্ষার সময় ছাড়া সেই নদী এখন হয়ে থাকে সম্পূর্ণ জলবিহীন।

2.5. **খরার চিত্র :** গত একশো বছরের হিসেবে এই অঞ্চলে বছরে গড়ে 20 ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। স্বাধীনতার আগে যেখানে কচিৎ খরা হতো, '72 এর পর থেকে সেই খানাপুর তালুক হয়ে উঠেছে খরাপ্রবণ। জোয়ার জাতীয় অল্প জলের ফসল ফলানোও কঠিন হয়ে গেছে। নদীর ধারের গ্রামবাসীরা সরকারের পানীয় জলের গাড়ির ওপর আজ নির্ভরশীল। কমতে থাকা পালিত পশুদের খাদ্য সংগ্রহ করতেও মানুষকে আজ সরকারের কাছে ঋণ (তাগাই) নিতে হচ্ছে। তীব্র জলাভাব আজ সর্বগ্রাসী।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করা চলে যে সাঙলি জেলারই মধ্য ভাগে আজ গ্রামের মানুষ দাবী করছেন যে ওই অঞ্চলে, সরকারের দেওয়া জল কম করে দিতে হবে কারণ জল বেশি আসার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক জল জমা আর লবণাক্ত হওয়ার সমস্যা। একই জেলার পাশাপাশি অঞ্চলে গড়ে উঠেছে দুটি বিপরীতধর্মী ছবি।

3. কৃষিকর্মের অচলাবস্থা ও খরার কারণ

জলাভাব এই সঙ্কটের এক প্রধান কারণ। কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না এ অঞ্চলে গত এক হাজার বছর ধরে স্থায়ী কৃষির ইতিহাস আছে। এটা ঠিকই যে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম। কিন্তু আরো কয়েকটা কারণ বোধহয় আছে।

3.1. **নতুন ফসলের আগমন ঃ** ষাটের দশক থেকেই আখ চাষ পশ্চিম মহারাষ্ট্রে খুব ব্যাপক হারে বাড়তে থাকে। এর একটা কারণ কৃষিতে পুঁজি এ সময় থেকে খুব বেড়ে যায়। আখ চাষ ও আখ-সংক্রান্ত শিল্প খুব দ্রুত রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। 20,604 হেক্টর জমিতে আখ চাষ হোত 1950-51 তে; সেটা

1980-81 তে বেড়ে দাঁড়ায় 85,399 হেক্টরে। যেহেতু আখ চাষে প্রচুর পরিমাণ জল লাগে তাই চাষ বেড়ে যাওয়ায় এবং পাশাপাশি বৃষ্টি বা সেচের জল কম থাকায়, প্রকৃতির কয়েকশ বছরের সঞ্চিত জলভাণ্ডারে টান পড়ে।

3.2. **সবুজ বিপ্লবের ফসল :** সবুজ বিপ্লব ষাটের দশকে উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশককে সঙ্গী করে নিয়ে আসে। এ ধরনের চাষেরও অতিমাত্রায় জলের প্রয়োজন। ফলে নব প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে পাম্পের সাহায্যে মাটির তলার জল তুলে আনা শুরু হয়। '61 সালে খানাপুরের 78 টা পাম্প বেড়ে '71 এ দাঁড়ায় 3,452, এবং '81 তে 23,100-য়। অন্যদিকে যেখানে '61 সালে 5,700 মেট্রিক টন সার ব্যবহার হয়েছিলো, '81 সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় 72,900 মেট্রিক টনে।

3.3. **বনাঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্তি :** ইংরেজ আমল থেকেই এই ধ্বংসের সূচনা। একদিকে বন কাটা হয়েছে আর অন্য দিকে সেই ফাঁকা জমিতে চাষ শুরু হয়েছে তুলো, হলুদ, ইত্যাদি অর্থকরী ফসলের। ষাটের দশক থেকেও একইভাবে আখ চাষের বিস্তার ও বৃদ্ধির শিকার হয়েছে বনাঞ্চল। গাছবিহীন মাটির জলধারণ ক্ষমতা কমেছে; মাটির ওপরের অংশ ধুয়ে গেছে বর্ষার জলস্রোতে; বেড়েছে ভূমিক্ষয়; কমেছে উর্বরতা; বাড়তে পারেনি মাটির তলায় কমতে থাকা জলভাণ্ডার।

কৃষিপ্রধান অঞ্চলের হাজার বছরের চাষের ঐতিহ্যের বিশ বছরের মধ্যে কী হাল! '83 সালে দেখা গেছে শুকিয়ে যাওয়া ইয়েরালা নদীর বুকে 122টা কুঁয়োর 100টা জলবিহীন। '76 এর 442 একর সেচভুক্ত জমি '86 সালে এসে দাঁড়িয়েছে 65 একরে। 85% হ্রাস—মাত্র দশ বছরে!

4. ইয়েরালা নদী থেকে বালি তোলা

এই জলশূন্য নদীর খাতে গড়ে 15 ফুট গভীর বালি জমে আছে। এখানকার বিশেষ ধরনের বালি, বাড়ি তৈরী ইত্যাদি কাজের জন্যে বিখ্যাত। ফলে '71 থেকেই বেসরকারী ঠিকাদার, বাজারের চাহিদা মাফিক, শুকনো নদীর খাত থেকে প্রচুর পরিমান বালি তুলতে শুরু করে। তাদের নজর, স্বাভাবিক ভাবেই, লাভের দিকে। আর সরকারের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে উদারনৈতিক। মৃতপ্রায় নদীর বুক থেকে বালি সরিয়ে নেওয়া যে কতটা ক্ষতি করতে পারে নদীর, মানুষজনের, আর মাটির তলার জল-ভাণ্ডারের, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি সরকার। শুরু হয় প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে অবাধ লুঠ।

4.1. **নদীর খাতে বালির ভূমিকা :** নদীর খাতে বালি থাকলে তা অনেক বেশি সময় ধরে, এবং অনেক বেশি পরিমানে জল ধরে রাখতে পারে। ফলে সেই জলের একটা বড় অংশ চুঁইয়ে মাটির তলার জল-ভাণ্ডারে চলে যায়। এইভাবে বর্ষার জল প্রাকৃতিক উপায়ে সঞ্চিত হতে থাকে। তা না হলে তা বয়ে চলে যায় সাগরের দিকে—এবং এক অর্থে, নষ্ট হয়। মাটির তলায় জলের ভাণ্ডার বাড়তে পেলে, জলের তল'ও উঠে আসে এবং সেই জল এমনকি অগভীর কুয়ো থেকেও ব্যবহার করা যায়।

4.2. **বালি তোলার বিপদ :** ঠিকাদার গোষ্ঠী বালি তোলার পর নদীর বুকে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি করে যায়। অন্যদিকে খানাপুর তালুকে এখন মাত্র 1% জমিতে বনাঞ্চল থাকার ফলে এমনিতেই ভূমিক্ষয় প্রচুর। ফলে বর্ষার জল নদীতে এলে ওই সব গর্ত জলে ভরে ওঠে। এরপর বৃষ্টি ধোওয়া পলি আর বালি মিশে গর্তগুলো বন্ধ হয়ে যায় এক ধরণের সিমেন্টের মতন পদার্থ দিয়ে। এর ভেতর দিয়ে মাটির তলাকার জলভাণ্ডারে জল চোঁয়ানো অসম্ভব। ফলে অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়।

4.3. **বালি তোলার বহর :** প্রতি 100 ঘনফুট বালি তোলার জন্যে সরকারী অনুমতি পত্র (পারমিট) পেতে জমা দিতে হয় দশ টাকা। ঠিকাদাররা ওই বালি 150 টাকা হারে বিক্রি করে। এদের মাসিক লাভের পরিমাণ অনায়াসে লাখ দেড়েকে দাঁড়ায়। ইয়েরালা নদীর ধারে 24টা গ্রাম বরাবর এই বালি তোলা চলছে। পাশাপাশি সরকারী নিয়ম-মাফিক তিনফুটের পরিবর্তে প্রায় দশফুট গভীরতা পর্যন্ত বালি তোলা হচ্ছে। যদিও বালি তোলা প্রথম শুরু হয়েছিল '71-'72 থেকেই, তা রমরমা ব্যবসা হয়ে দাঁড়ায় '81 সাল থেকে। 75,000 মানুষ আর 95,000 একর জমি যে ইয়েরালা নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই নদীর প্রাকৃতিক সম্পদ কিছু মানুষের ব্যক্তিগত লাভের স্বার্থে সরকার বিনষ্ট করতে অনুমতি দিল। সব মিলিয়ে দেখা দিল এক অসহনীয় অবস্থা।

5. 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলন

ঠিক এমনি এক অবস্থায় বোম্বাইতে শুরু হলো বিশাল সুতোকল (টেক্সটাইল) ধর্মঘট (1982-83)। খানাপুর তালুকের সেই সব গ্রামবাসী যারা '70 দশকের মাঝামাঝি গ্রাম ছেড়ে শহরের সুতোকল-শ্রমিক হয়েছিলেন, তাঁরা আবার ফিরে এলেন।

5.1. **'মুক্তি সংঘর্ষ'-এর জন্ম :** এই অঞ্চলে সরকারের এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কীম (ই জি এস) চালু ছিলো যাতে খরা কবলিত গ্রামের মানুষরা মজুরের কাজ করতেন। বোম্বাই'এর শ্রমিকরা গ্রামে ফিরে সেই ই জি এস-এ কাজ করতে শুরু করেন। তখনই তৈরী হয় এক আলগা সংগঠন। এর প্রথম উদ্দেশ্য ছিলো শহরের ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্যে গ্রামের মানুষদের সমর্থন ও সহযোগিতা চাওয়া এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো ই জি এস-এর নানান দিক নিয়ে আন্দোলন করা। যেমন—ঠিক মতন সবার জন্যে কাজ ও যথেষ্ট মজুরী দাবী করা; ঘুষ বা চুরির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া; কাজের জায়গায় পানীয় জলের এবং বাচ্চা রাখার জায়গার বন্দোবস্তো করার দাবী ইত্যাদি। এইভাবে সুতোকল-শ্রমিক ও কৃষকদের লড়াই, খানাপুর তালুকে এক সাথেই চলছিলো। '83 তে ধর্মঘট শেষ হতেই শ্রমিকরা ই জি এস ছেড়ে কারখানায় ফিরলেন। কিন্তু এই শ্রমিক-কৃষক ঐক্যকে সজীব রাখতে, আলোচনার মধ্যে দিয়ে তৈরী হোলো 'মুক্তি-সংঘর্ষ চালওয়াল'। এই সংগঠনে যোগ দিলেন এই অঞ্চলের শ্রমিক, কৃষক, দলিত, মহিলা, বিজ্ঞানকর্মী এবং শ্রমিক মুক্তি দল ও পেজেন্ট ওয়ার্কাস পার্টির মতো বাম ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের কিছু কর্মী।

5.2. **আন্দোলনের গতিপথ :** 'মুক্তি সংঘর্ষ' তৈরী হবার পর থেকেই আন্দোলনের গতিপথ কিছুটা বদলে গেলো। দাবী করা হলো যে ই জি এস এর মাধ্যমে শুধু পাথর ভাঙ্গানো বা রাস্তা তৈরী করানো চলবে না। অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী খরাক্রান্ত কৃষিকে সাহায্য করার জন্যে সেচ জলাধার, গ্রামের জলাশয় খনন, বনসৃজন, খুব ছোটো বাঁধ তৈরী করা ইত্যাদিতে ই জি এস শ্রমিকদের কাজে লাগাতে হবে। মজুরীই শেষ কথা নয়!

এই সময় নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আন্দোলনকারীরা উপলব্ধি করেন যে খরা মানুষেরই সৃষ্টি। আর সবুজ অরণ্য, জলভরা ইয়েরালা নদী আর খেত খামার ফিরিয়ে আনা যেতেই পারে সকলের পরিকল্পিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। শুরু হল খরা রোধ করার আন্দোলন।

5.3. **'বিজ্ঞান যাত্রা' ও অঞ্চলের সমীক্ষা :** এই সময় আয়োজন করা হয় এক 'বিজ্ঞান যাত্রা'র যার মূল উদ্দেশ্যে ছিলো খরার কারণ নির্ধারণ করা আর খরা রোধ করার উপায় সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা। একটা গ্রামে আলোচনা শেষ করে সেই গ্রামের মানুষজন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ও বিজ্ঞানকর্মীদের সঙ্গে 'যাত্রা' নিয়ে যেত পরের গ্রামে যেখানে আবার চলত আলোচনা। এইভাবে তালুকের প্রতিটি গ্রামে ঘুরেছিল এই যাত্রা।

এর পাশাপাশি চালু হলো খানাপুর তালুকের নদী, নালা, পুকুর, জমির ঢাল, কুয়োর অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে এক ব্যাপক বিজ্ঞান-ভিত্তিক সমীক্ষা। এতেও ভাগ নিয়েছিলেন 'মুক্তি সংঘর্ষে'র সক্রিয় শ্রমিক, কৃষক, বিজ্ঞানকর্মী আর প্রতিটা গ্রামের অভিজ্ঞ মানুষজন।

'বিজ্ঞান যাত্রার' শিক্ষা আর অঞ্চলের বিস্তারিত সমীক্ষার তথ্য নিয়ে তৈরী হলো খানাপুর তালুকে খরা রোধ করার প্রাথমিক এক সামগ্রিক পরিকল্পনা—সাধারণ মানুষের তৈরী, নিজেদের প্রয়োজন মাফিক।

5.4. **বিশ্ববিদ্যালয় ও 'মুক্তি সংঘর্ষ' :** '85-র আগষ্ট মাসে এক অভূতপূর্ব মিছিলের আয়োজন করে 'মুক্তি সংঘর্ষ'। এই মিছিলে বেশ কয়েকশ গ্রামবাসী গিয়ে পৌঁছয় কোলহাপুর শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রশ্ন রাখা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছে যে কেন ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকরা খরার মোকাবিলায় বিকল্প পরিকল্পনা ঠিক করা ও রূপায়িত করার কাজে তাদের সাহায্য করবে না? কেন এন এস এস-জাতীয় সংগঠনের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুই রাস্তা পরিষ্কারের কাজ করবে? —এই ধরণের উপস্থাপনায় অভাবনীয় ফল পাওয়া যায়। যদিও প্রথম দিকে ভীত কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকেন সম্পত্তি রক্ষার জন্যে কিন্তু পরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এক স্থায়ী 'খরা-রোধক কমিটি'ও তৈরী করা হয়, যে কমিটি আন্দোলনকে নানান বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করে পরবর্তীকালে। পাশাপাশি এই অঞ্চলের বারোটা কলেজের ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষকরা 'খরাসংক্রান্ত শিবির' চালাতে শুরু করে অনেক গ্রামে। খরাত্রাণের গণ্ডি ছাড়িয়ে খরা রোধ করার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ও একভাবে সামিল হয় 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলনে।

5.5. **সরকারের ওপর অনাস্থা ও 'মুক্তি সংঘর্ষে'র সিদ্ধান্ত :** সাধারণ মানুষের স্ব-উদ্যোগী হয়ে ওঠার একটা কারণ হলো সরকারের ওপর অনাস্থা—যার প্রতিমূর্তি হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে বালাওয়াডি বাঁধ। '50 এর দশকের শেষ দিকে তৈরী হয় ইয়েরালার বুকে এই সরকারী বাঁধ। প্রথম বছর সেচের জল দিয়েছিল প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 460 হেক্টর জমির 20 হেক্টরে (4% মতন)। তারপরই পলি জমে বাঁধ অচল হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে অবশ্য 26 কিলোমিটার লম্বা সেচ খালে মাটি কাটা হত প্রতি বছর—তবে সে খালে কোনোদিন জল বয়ে যায়নি। '85-র অক্টোবরে খরা নিয়ে খুব সফল এক কনফারেন্স সংগঠিত করে 'মুক্তি সংঘর্ষ'। পাশাপাশি চলতে থাকে অবস্থান, মিছিল ও প্রতিবাদ সভা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। পরিকল্পনার খসড়া পাঠানো হয় বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে মন্তব্য ও রূপায়ণের জন্যে।

শেষ পর্যন্ত '86র অক্টোবরে, সমস্ত দিক নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে এটা ঠিক হয় যে 'মুক্তি সংঘর্ষ' তাদের নিজেদের একটা বাঁধ তৈরী করবে বালাওয়াডি ও তেণ্ডুলওয়াডি বরাবর, ইয়েরালার ওপরে। নিয়মমাফিক বাঁধ সংক্রান্ত লিখিত পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয় সাঙলির ডিষ্ট্রিক্ট কালেক্টরের কাছে। সরকারী নির্লিপ্ততার বিরুদ্ধে এক অদ্ভুত পদক্ষেপ!

নভেম্বর 23, 1986—বাঁধের কাজ প্রাথমিক ভাবে শুরু হয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান; বিশেষজ্ঞদের সাহায্য; শিক্ষক-ছাত্র বিজ্ঞানকর্মী'দের সক্রিয় ভূমিকা; সি পি এম, জনতা পার্টির মতন রাজনৈতিক দলের সমর্থন; সমাজকর্মী ও সাংবাদিক মহলের প্রতিনিধিত্ব—সব মিলিয়ে তখন মনেই হচ্ছিল যে এই উদ্যোগের বাস্তব রূপায়ণে বাধা অতি সামান্যই থাকবে।

6. বলিরাজা বাঁধ নিয়ে পরিকল্পনা

বোম্বাই-এর একজন ইঞ্জিনিয়ার, কে আর দাতে, 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। বাঁধের প্রযুক্তির দিকটায় তিনি প্রধান উপদেষ্টা। আর কাকে কতটা জল দেওয়া হবে; কী কী প্রয়োজনে সে জল ব্যবহার করা যাবে; কোন ধরণের ফসল ফলবে; চাষের ধরণের কোথায় কী রকম পরিবর্তন হবে—এ রকম নানান দিকের পরিকল্পনা করেন গ্রামের অভিজ্ঞ মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-গবেষক আর 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলনের বিভিন্ন ধরণের কর্মীরা মিলে।

6.1. **প্রযুক্তির দিকটা :** বাঁধ 120 মিটার লম্বা আর সাড়ে চার মিটার উঁচু হবে। 150 লক্ষ ঘন ফুট জল নদীর বুকে আটকানো যাবে। বন্যার সময়কার জল ছাড়া, প্রায় 2200 বর্গ কিমি অঞ্চলের বর্ষার জল ওই বাঁধের জলাধারে জমা হবে। বাঁধে বেশ কয়েকটা জলপথ থাকবে। জলাধারে পলি বা মাটি জমে যাতে বাঁধ অকেজো না হয়ে পড়ে তার জন্যে বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী 900 একর জমিতে পাম্পের সাহায্যে জলাধার থেকে অল্পদামী, নমনীয় পাইপ দিয়ে জল বয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যাতে জল নষ্ট কম হয়।

6.2. **কে কতটা জল পাবে :** গ্রামবাসীরা আলোচনা করে ঠিক করেছেন যে জমির হিসেব অনুযায়ী জল দেওয়া হবে না। প্রতিটা পরিবার, তাদের যতজন সদস্য, সেই হিসেবে জল পাবে। ভূমিহীন পরিবার তাদের প্রাপ্য জল নিয়ে অন্যের জমিতে চাষ করতে পারে বা বিক্রিও করতে পারে। জলের জন্যে 'শেয়ার' সংগ্রহ করতে হবে দশটাকা বা একদিনের শ্রমের বিনিময়ে। কিন্তু পরিবারের মোট 'শেয়ার' সংখ্যা, সদস্য সংখ্যার সমান হবে।

6.3. **কী ভাবে জল ব্যবহার করা যাবে :** ঠিক হয়েছে প্রথম পর্যায় তেঙুলওয়াডি গ্রামের 100টা পরিবারের 300 একর জমি পরিকল্পনার আওতায় আসবে।

প্রতিটা পরিবার তাদের জমির প্রায় 40% অংশে গাছপালা লাগাবে। যে জল পাওয়া যাবে তার প্রায় 30% বরাদ্দ থাকবে এই 40% জমির গাছ পালার জন্য।

বাকি 60% জমিতে হবে চাষ। এই জমির চার ভাগের তিন ভাগে হবে সারা বছরের মূল খাদ্য যোগানকারী শস্য। এক্ষেত্রে জোয়ার। বাকি একভাগ থাকবে সবজি চিনেবাদাম ইত্যাদির জন্যে। এই 60% চাষের জমির জন্যে থাকবে মোট জলের প্রায় 60%।

বাকি 10% জল থাকবে খাবার জন্যে, বাড়ির অন্য কাজের জন্যে আর পালিত পশুদের জন্যে। অতিবৃষ্টি বা একাধিক বন্যার ফলে জলাধারে জল হিসেবের বেশি থাকলে তা আবার ভাগ করে দেওয়া হবে সেই 15% জমির সবজি, চিনেবাদাম, ছোলা বা কলাই ইত্যাদি ফসলের জন্যে।

6.4. **প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থাতে পরিবর্তন :** প্রথমতঃ ঠিক হয়েছে এই অঞ্চলে আখ চাষ বন্ধ হবে। আখ বা কলা জাতীয় ফসলের জন্যে প্রচুর পরিমান জল লাগে। খরা কবলিত অঞ্চলে, পরিবেশের ক্ষতি না করে এই জল সংগ্রহ করা খুব কঠিন। ফলে ঠিক হয়েছে, জলের চাহিদা বেশি এমন ফসল ফলানো হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধান্ত হয়েছে চাষের কাজে প্রচলিত রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করা হবে না। পরিবর্তে পাতা, ডালপালা, গোবর ইত্যাদি থেকে গ্রামে তৈরী জৈবিক সার ব্যবহার করা হবে।

তৃতীয়তঃ বন সম্পদ বাড়ানোর কাজে (সিল্‌ভিকালচার) পরিকল্পনা অনুযায়ী জোর দেওয়া হবে। কারণ এরফলে ভূমি ক্ষয়ের হার কমবে ; মাটির খনিজ সম্পদ রক্ষা পাবে ; প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যাবে ; পাতা, ছাল, ডালপালা ইত্যাদি জৈবিক সার (বায়োমাস্) তৈরীর কাজে লাগবে ; কিছু ফল মূল সংগ্রহ করা যাবে ; পরিবেশের ক্ষতি না করে কাঠ, পশুখাদ্য বা জ্বালানি বিক্রি করে অল্প আয়ও হবে।

'মুক্তি সংঘর্ষ' মনে করে যে ওপরের উল্লেখ করা তিনটে সিদ্ধান্তের ফলে বেশির ভাগ মানুষই কাজ পাবে স্থানীয় কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ; তাদের ফসল থেকেই আসবে তাদের সারাবছরের খাদ্য ও নিরাপত্তা ; স্থানীয় পরিবেশ ব্যবস্থা ভারসাম্য ফিরে পাবে ; চাষের জন্যে অনেক কম টাকা বিনিয়োগ করতে হবে; আর সর্বোপরি, খরা-ক্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষদের পরমুখাপেক্ষী ও নৈরাশ্যবাদী মানসিকতার পরিবর্তন হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে।

6.5. **বাঁধের খরচ :** পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধের জন্যে খরচ প্রায় দশ লাখ টাকা। ঠিক করা হয়েছিল যে সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পত্র (পারমিট) চাওয়া হবে আইনমাফিক সাত লক্ষ ঘনফুট বালি তোলার জন্যে। ঠিকাদাররা যতটা বালি এক বছরে তোলে, তার এক খুব ছোটো অংশ তুললেই, বালি বিক্রির টাকায়, বাঁধ তৈরী করা যাবে। বলা হয়েছিল খরা-সৃষ্ট বালি, যদি বিজ্ঞান মেনে তুলে। খরা-রোধ করার কাজে লাগানো হয়, তা হলে খারাপ কি। আর এছাড়া গ্রামের মানুষ ও অঞ্চলের কলেজগুলোর শিক্ষক-ছাত্রদের শ্রমদান থেকেও সাহায্য আসবে।

7. বাঁধের প্রস্তুতি, বিরোধিতা ও আন্দোলন

7.1. **বালি তোলার অনুমতি পত্র :** '86-র নভেম্বরে সরকারী ঘোষণা হলো যে বালি তোলার অনুমতি পত্র দেওয়া বন্ধ হয়ে চালু হবে বালির নিলাম ব্যবস্থা। 'মুক্তি সংঘর্ষ' কে টেক্কা দিতে হবে কোটিপতি ঠিকাদারদের সঙ্গে। তুমুল বিক্ষোভ, অবস্থান, প্রতিবাদ মিছিলের ফলে পারমিট ব্যবস্থা আবার চালু হলো কিন্তু 14 জানুয়ারি, 1987তে তা ফের বন্ধের ঘোষণা হলো। মাঝের দেড় মাসে বালি তুলে 70 হাজার টাকা তহবিলে জমা পড়লো।

7.2. **ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান :** চরম সরকারী বাধার মধ্যেই 25 জানুয়ারী, 1987 এই বিশাল অনুষ্ঠান হয়। দু মাস আগেকার বাঁধের কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মতনই গ্রামবাসী ছাড়াও হাজার খানেক ছাত্র, শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী ও বেশ কিছু অন্যান্য অতিথি সমাগমে প্রমানিত হয় যে বলি রাজা বাঁধ মহারাষ্ট্রে বিপুল জনসমর্থন পেতে শুরু করেছে।

7.3. **'87 সালের আন্দোলন ও বিরোধিতা :** বাঁধের সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী। হাজার হাজার গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের পাশে ছিল মহরাষ্ট্রের অন্য অংশের বেশ কিছু মানুষের সমর্থন। কিন্তু সরকার বাঁধ তৈরীর বা বালি তোলার অনুমতি দিতে নারাজ। কেন দেওয়া হচ্ছে না সে সম্পর্কেও কোনো সরকারী মতামত নেই। চলতে থাকল ব্যাপক আন্দোলন, সরকারী দপ্তর ঘেরাও, গ্রেপ্তার বরণ, অনশন। এ অবস্থায় সরকারী ঘোষণা হলো যে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না কারণ বালাওয়াডির কাছে যে সেতু তৈরীর পরিকল্পনা আছে তা ব্যাহত হবে বাঁধ তৈরী করলে। যে নদীতে '80'র দশকে বছরে গড়ে দশ দিনও জল থাকে না তার ওপর সেতু নির্মাণ-পরিকল্পনা খরা-রোধ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদিকে অবহেলা করে ! এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া বোধ হয় সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

7.4. **ঠিকাদার-সরকারী কর্মচারী-রাজনীতিবিদ্ চক্র :** আন্দোলনের পাশাপাশি ঠিকাদারদের ভাল জায়গা বেছে, বেশী পরিমাণে বালি ওঠানোর কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি।

'88 সালের গোড়ায় দেখা যায় যে কোনো এক ঠিকাদারের হিসেব অনুযায়ী বালি তোলা হয়েছে তিন লক্ষ ঘন ফুট, সরকারী খাতাপত্তর অনুযায়ী দেড় লক্ষ, কিন্তু নদীর বুকে হিসেব করে দেখা যায় বালি উঠেছে সাড়ে দশ লক্ষ ঘনফুট।

'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলন যখন প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে আহ্বান জানিয়েছিলো বালি তোলার বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদপত্র সরকারের কাছে জমা দিতে, তখনই স্থানীয় এম এল এ-র সক্রিয়তা প্রথমবারের মতন চোখে পড়ে। তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন এই প্রতিবাদ পরিকল্পনা বানচাল করতে।

'88র জানুয়ারীতে বেআইনি কাজের অভিযোগে বালি বোঝাই বেশ কয়েকটা ঠিকাদারদের লরি 'মুক্তি সংঘর্ষ' আটকে দেয় নদীর বুকেই। সেই নিয়ে মহারাষ্ট্রের ছোট বড় খবরের কাগজে প্রচুর লেখালেখিও হয়। পরে মিরাজের এস ডি ও সাহেব পুলিশকে দোষী সাব্যস্ত করেন তাঁর অনুসন্ধান রিপোর্টে—কারণ তারা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে উচিত ব্যবস্থা নেয়নি!

7.5. **সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী :** '88-র জানুয়ারিতে 'এক সাংবাদিক সম্মেলনে, সাঙলির কালেক্টর এটা বোঝানোর চেষ্টা করেন যে ঠিকাদারদের বালি তোলার অনুমতি দিয়ে সরকারের বেশ 'ভালোই লাভ' হচ্ছে কারণ এযাবৎ জমা পড়েছে প্রায় সাড়ে ন লাখ টাকা। বালির নিলাম করলে লাভ বাড়বে। আর ক'বছর এই লাভজনক প্রকল্প চলতে পারে, বা কোনো পরিবেশগত ক্ষতি হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।

পাশাপাশি সরকারী তথ্য অনুযায়ী, '84 সালেই পশুখাদ্যের জন্যে ঋণ দেওয়া হয়েছে 12 লাখ ; '83 থেকে '85-র মধ্যে পানীয় জল বাবদ খরচ হয়েছে 98 লাখ ; খরা কবলিত এ' অঞ্চলে ই জি এস-এর খরচ তো আছেই। অন্যদিকে, 20 লাখ টাকা খরচের 'বলিরাজা বাঁধ'-জাতীয় প্রকল্পের সাহায্যে খানাপুরের চাষযোগ্য জমিতে প্রতি বছর শুধু জোয়ার উৎপন্ন হতে পারে সাড়ে 11 কোটি টাকার।

কয়েকজন ঠিকাদারকে বালি তোলার অনুমতি দেওয়া, হাজার হাজার গ্রামবাসীর উন্নতি-কল্পে পরিকল্পিত বাঁধের বিরোধিতা করা, পরিবেশের ক্ষতির সম্ভাবনা ঠিক মতন খতিয়ে না দেখা, আর 16 বছরে সাড়ে ন লাখ টাকাকে 'ভালোই লাভ' বলা—এসবই সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক!

7.6. **আশার আলো :** বালি বোঝাই লরি আটকানোর সাথে সাথেই শুরু হয় আমৃত্যু গণ-অনশন। চতুর্থ দিন সরকার ঘোষণা করেন যে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি বসানোর কথা ঠিক হয়েছে যাঁরা খতিয়ে দেখবেন নদীর বুক থেকে বালি তোলার কুফল। এবং এর পরেই '88 সালের মার্চে, দীর্ঘ দেড় বছরের আন্দোলনের পরে বলিরাজা বাঁধের সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়।

8. বাঁধ তৈরীর কাজ

নীচের থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষের আন্দোলনের চাপের মুখে সরকারের এই সম্মতি এক ব্যতিক্রমমূলক দৃষ্টান্ত। সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে, গ্রামবাসী এবং ছাত্ররা শ্রমদানের জন্যে তৈরী—ফলে কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষামাত্র।

8.1. **বাধা—আবার সেই বালি :** যে লিখিত প্রকল্প অনুমোদন পেলো তাতেই বলা ছিলো বালি ওঠানোর অনুমতিপত্রের কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো অনুমতিপত্র লাল ফিতের ফাঁসে আটকানো। মার্চ থেকে জুন '88, অনুমোদন পাওয়ার পর এই চার মাসে বাঁধের কাজ, তহবিলে জমানো টাকায় অল্প এগোয় ঠিকই, কিন্তু তারপরই সব আটকে যায়।

8.2. **টাকা তোলার বিকল্প ব্যবস্থা :** '88-র বর্ষার জল নদীতে আসার আগে অন্ততঃ আরো এক ফুট মতন বাঁধের কাজ শেষ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে হলো। তা না হলে পলি জমে সেই অল্প হওয়া কাজও নষ্ট হবে। ফলে পুনে ও বোম্বাই শহরে 'বলিরাজা বাঁধ সহায়ক সমিতি' তৈরী হলো এবং সুদহীন ঋণ চাওয়া হলো সমর্থনকারী ব্যক্তি বা সংগঠনের কাছ থেকে। কয়েকদিনের মধ্যেই ঋণ পাওয়া এক লাখ টাকা দিয়ে তখনকার মতন বিপদ দূর হলো। ডিসেম্বর '88 তে শেষ পর্যন্ত বালি ওঠানোর অনুমতিপত্র এসে যেতেই পুরোদমে কাজ চললো আর ফেব্রুয়ারি '89-এর মধ্যে বালি তোলা বাবদ জমা পড়ল চার লাখ টাকা।

8. 3. **বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট :** সরকারী সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলো এরই মধ্যে, '88-র শেষে। বালি তোলার কুফল সম্পর্কে, রিপোর্টের বক্তব্য এবং 'মুক্তি সংঘর্ষে'র বক্তব্য দেখা গেলো প্রায় একই। এই সরকারী রিপোর্টে আরো বলা হলো যে আয় কমে গেলেও, শুধু সরকারী কাজে আর অঞ্চলের মানুষদের স্বার্থে অল্প বালি তোলার অনুমতি দেওয়া উচিৎ ; বালি তোলা হয়নি এমন জায়গা বা ভবিষ্যতে বাঁধের জলাধারের মধ্যে পড়বে এমন জায়গা থেকেই শুধু তিন ফুট গভীরতা পর্যন্ত বালি ওঠানো যাবে ; কিছু অঞ্চলে বালি তোলা হবে নিষিদ্ধ।

8. 4. **উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও সরকারী বাধা :** 5 মার্চ, 1989। হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে উদ্বোধন হয়ে গেলো বলিরাজা বাঁধের। ঋণের টাকা ফেরৎ দেওয়া হলো, সম্বর্ধনা জানানো হলো সমর্থক সংগঠন ও ব্যক্তিদের। হিসেব অনুযায়ী, সরকারের যা খরচ হতো তার অর্ধেকে তৈরী হলো এই বাঁধ।

নদীর বুকে বাঁধের ফলে শুকনো খাত ভরে উঠলো জলে। বাকি থাকলো বাঁধ থেকে জল বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং কো-অপারেটিভ সমিতির মাধ্যমে তা' বিলি করার কাজ।

জল বয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার জন্যেও ঠিক ছিলো বালি বিক্রি করে টাকা ওঠানো হবে। সরকার নিজেদের দেওয়া অনুমোদন থেকে সরে এলেন। বালি তোলার অনুমতিপত্র দেওয়া বন্ধ হলো। চললো আলোচনা, আন্দোলন, নিলিপ্ততা। নতুন ভাবে নিলাম ডাকার প্রস্তুতি নিতেই '89এর নভেম্বরে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করলো 'মুক্তি সংঘর্ষ'। বালি নিলামের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি হলো।

মার্চ, 1990। বলিরাজা বাঁধ উদ্বোধনের পর এক বছর অতিক্রান্ত।

এই সময় কোনো বিশেষ আইনের ফাঁক দেখিয়ে বালি নিলামের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করলো বোম্বাই হাইকোর্ট। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট অগ্রাহ্য করে ততটা বালি নিলামে তোলা হলো যতটা বালি গত পাঁচ বছরেও ওঠানো হয়নি! অবশ্য '90 এর মে মাসে 'মুক্তি সংঘর্ষে'র চেষ্টার ফলে দেখা গেলো নিলামযোগ্য বালির দুশো ভাগের এক ভাগ মাত্র বিক্রি হলো। কিন্তু বালি তোলার অনুমতি পেলো না 'মুক্তি সংঘর্ষ'!

8.5. **আজকের অবস্থা:** দু'দুটো বর্ষার জল জমলো কিন্তু সরকারী অসহযোগিতার ফলে তা ব্যবহার করা গেলো না। ফলে '90 সালের জুন মাসে, বাঁধ উদ্বোধনের পনের মাস পরে, 'মুক্তি সংঘর্ষ' বাধ্য হয়ে আবার আর্থিক সাহায্য চাইলো সহৃদয় সহযোগীদের কাছে। দেড় লাখ টাকা ঋণ আর একটি সংস্থা 'কাপার্ট' থেকে আট লাখ টাকা অনুদান নিয়ে '91-এর গোড়া থেকে বলিরাজা বাঁধের কাজ আবার শুরু করা গেছে। আশা করা যায় 300 একর জমিতে চাষের জল পৌছানোর খবর যে কোনোদিন পাওয়া যাবে। এক সফল রূপ পাবে বলিরাজা বাঁধ! কিন্তু কে জানে আরো কত বাধা এখনও জমা আছে!

9. আলোচনা

9.1. বলিরাজা বাঁধকে শুধু খরা অঞ্চলের মানুষের জলাধার তৈরির প্রচেষ্টা হিসেবে দেখাটা ঠিক হবে না। এই আন্দোলন দেখাতে চাইছে যে জলের সমবণ্টন, ভূমিসংস্কার ও বিজ্ঞান প্রয়োজন ভিত্তিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের প্রথার পরিবর্তন করার চেষ্টা করলে খরার মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। বলিরাজা আন্দোলন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সম্পদের ওপর ব্যক্তি-মালিকানার নিয়ন্ত্রণ খর্ব করার আন্দোলন। অন্যদিকে সেই সম্পদের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার আর মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে বিবাদ না ঘটিয়ে এক প্রগতি পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার আন্দোলন।

9.2. বলিরাজা বাঁধের অভিজ্ঞতা সরকারের কিছু ঘোষিত নীতি ও বক্তব্যের অন্তঃসারশূন্যতার দিকে ইঙ্গিত করে। একদিকে যেমন 'উন্নতিকল্পে সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ'-এর কথা বলা হয়—অন্যদিকে বলিরাজা বাঁধের মতন স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। যারা 'বনস্থজন', 'পরিবেশ সুরক্ষা' বা 'খরা ত্রাণ' এর কথা বলে তারাই গাছ, বালি বা জলের লুটেরাদের সাহায্য করে। অর্থাভাবে সরকার যখন বাঁধ বা বনস্থজন-জাতীয় উন্নতি প্রকল্প বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়—তখন অতি অল্প খরচের বিকল্প চিন্তা উত্থাপিত হলেও, সরকারী বাধা চরমে পৌছয়।

9.3. এ ধরণের ছোটো মাপের কৃষি-সেচ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরকারী বাধা শুধুই কি আমলাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপর নির্ভরশীল? সেচ, ভারতে, চিরকালই এক রাজনৈতিক প্রশ্ন। কোন অঞ্চল কতটা জল পাবে তা অবধারিতভাবে ঠিক করে দেবে রাষ্ট্র। অঞ্চলের রাজনীতির প্রভাব তাই গুরুত্বপূর্ণ। চিনি শিল্পপতিরা মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে অগ্রগণ্য—কথায় বলে 'সুগার লবি'। এ ধরণের ছোটো সংরক্ষণমূলক সেচের পরিকল্পনা সফল হলে মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ এই ব্যবস্থার দিকে ঝোঁকার প্রবণতা দেখাতে পারে। কারণ বলিরাজা বাঁধ মাঝারি, ছোটো ও ভূমিহীন চাষীদের স্বনির্ভরতা ও নিরাপত্তার প্রতীক হয়ে উঠতে পারে। তাহলে অন্যান্য চাষ, বনস্থজন ইত্যাদি বাড়লে আখ চাষের ওপর বর্তমানের ঝোঁক অনেক কমে যাবে। ফলে লাভ ও ক্ষমতা কমতে পারে 'সুগার লবি'র।

9.4. বলিরাজা বাঁধ সত্যিই অনেক দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলেও আন্দোলনের ধরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমমূলক বোধহয় নয়। চিপ্‌কো, কোয়েল কারো, বালিয়া পাল—বা নর্মদা বাঁচাও, হুতাত্মা চিনিকল, কামানি টিউবস্—বা শ্বেতকারী সংগঠন, ওয়ামবোরী চারী, ভিটনার—এ ট্র্যাডিশন নতুন চালু হয়েছে! এক-স্তম্ভ-শিলার মতন যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির দলগুলো আমরা চারদিকে দেখি—তাদের কাজ, আন্দোলন, চিন্তা-চরিত্রের সঙ্গে আমরা পরিচিত। নতুন ট্র্যাডিশনের নীচে থেকে উঠে আসা, সংঘবদ্ধ প্রয়াস কেমন যেন 'অন্য' রকম লাগে।

9.5. গণবিজ্ঞান আন্দোলনের কর্মীদের ভূমিকা এক্ষেত্রে, প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের বিজ্ঞানযাত্রা বিজ্ঞানকে 'অজ্ঞ' মানুষের কাছে পৌছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে চালু হয়নি। বরং অভিজ্ঞ মানুষকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি অর্থাৎ বাঁধ ও চাষবাস সংক্রান্ত আলোচনায় অংশ নেওয়ানো ছিল উদ্দেশ্য। আর গ্রামের সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানযাত্রা বা সামগ্রিক আন্দোলনে যোগদান শুধু ভিড় বাড়ানোর জন্য হয়নি। এখানে 'যোগদান' মানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটাতেও থাকা, আন্দোলন কোন দিকে যাবে তা ঠিক করা, বাইরে থেকে আসা চিন্তা বা জ্ঞানকে নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করা ইত্যাদি।

গ্রামবাসীদের সক্রিয় ভূমিকা বিজ্ঞানকর্মীদের আরও শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছে। বিজ্ঞানকর্মীরা আরও বই পড়তেই পারেন। কিন্তু বলিরাজা বাঁধের ক্ষেত্রে, আক্রান্ত মানুষদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছাড়া সমাধান যে প্রায় অসম্ভব সেটা 'মুক্তি সংঘর্ষ'র বিজ্ঞানকর্মীরা পরিষ্কার বুঝেছিলেন। বস্তুতঃ ওই বিজ্ঞানযাত্রা খরা দূর করার জন্য কোন ধরণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সবচাইতে সফল হবে সেটা সবাই মিলে পরখ করে দেখার ও নির্ধারণ করার সুযোগ করে দিয়েছিল।

9.6. আমাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়, বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবনে 'প্রতিষ্ঠার', এক গুরুত্বপূর্ণ সোপান। 'অযথা' সময় নষ্ট করার সময় থাকে না। ব্যতিক্রম চোখে পড়ে ছাত্র-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বা অন্য কোনো সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িয়ে থাকা খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে। 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলন আহ্বান জানিয়েছিলো এই রকমই এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলকে। এটা কেমন অচেনা ঠেকে। যেমন অচেনা ঠেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-গবেষক-শিক্ষকদের সাধারণ গ্রামের মানুষদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে অংশ নিতে দেখলে। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে ভালো হয়, ঘটতেই পারে—কিন্তু সচরাচর ঘটে না। তাই এরকম কিছু হলে—কেমন 'অন্য রকম' লাগে।

9.7. ধর্মঘটী শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় কিছু কর্মীদের, ধর্মঘট চলাকালীন, গ্রামে-ফেরা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সাহায্য করার দৃষ্টান্ত খুব বেশী চোখে পড়ে না। খানাপুর সেখানেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অন্যদিকে, শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের স্লোগান খুবই সঠিক ও জোরদার। কিন্তু খুব বেশী চোখে পড়ে না শহরের শ্রমিকদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ, কৃষক মজুরদের গ্রামের লড়াইয়ে। হতাশা, নেতিবাচক মনোভাব, আত্মকেন্দ্রিকতা, উদ্যোগহীনতা, নিষ্ক্রিয়তা, 'ভাগ্য-বাদ' ইত্যাদি যখন উত্তরোত্তর বাড়ছে, সেই সময় এ ঘটনার তাৎপর্য্য কতোটা ?

9.8. বলিরাজা বাঁধ জাতীয় প্রকল্পকে কোনো কোনো বামপন্থীদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের আন্দোলনকে সংশোধনবাদী এক চেষ্টা বলে চিহ্নিত করা হয়। আরো বলা হয় যে গ্রামের মানুষ যদি নিজেরাই বাঁধ তৈরী করেন তাহলে তার ফলে সরকারকে দায়মুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে 'মুক্তি সংঘর্ষ'-র বক্তব্য হলো যে সবজায়গায় সাধারণ মানুষই বাঁধ তৈরী করবে এমনটা নয়। কিন্তু তারা মনে করে যে গ্রামের মানুষের প্রয়োজন-ভিত্তিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ কয়েকটা আদর্শ অনুকরণীয় (মডেল) প্রকল্প চালু করে সেগুলো চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সরকারী প্রগতি পরিকল্পনার বিকল্প শুধু খাতায় কলমে থাকলে চলবে না। সেই সব বিকল্প চিন্তার বাস্তব সফলতা, নীচের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করবে ক্ষমতায় থাকা রাজনৈতিক দলের ওপর। তা না হলে চিরকাল সেই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রগতি পরিকল্পনা চালু রাখবে শাসক দল। আর বামপন্থী দলগুলো সেই সব চাপিয়ে দেওয়া প্রকল্পগুলোর ভেতরেই দাবী-দাওয়ার আন্দোলনের আবর্তে আটকে থাকবে। সৃষ্টি হবে ভোপাল, বালিয়াপাল, নর্মদা, পারমাণবিক চুল্লি বা পলি পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া 50 এর দশকের বালাওয়াডি বাঁধ।

9.9. বলিরাজা বাঁধ আর সবুজ বিপ্লব এই দুটি বিষয়কে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে কয়েকটি জিনিস একটু পরিষ্কার হতে পারে। দুটিই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফল। এক চিরায়ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অনুগত থাকতে, শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয়েছে আমাদের ইস্কুল জীবন শুরু থেকেই। অথচ বলিরাজা বাঁধের প্রযুক্তি আর সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তি আমাদের কি দেখায় না, আসলে দুটো প্রযুক্তিই আলাদা ধরণের ? একদিকে নীচের তলার মানুষের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিজ্ঞানকে মানবিকতার সাথে ব্যবহার, মানুষের স্বেচ্ছাশ্রম এবং প্রকৃতিকে বুঝে প্রাকৃতিক সম্পদকে বাঁচিয়ে রেখে তার ব্যবহার, যার ফল—সমাজের সবার বিশেষত গরীব মানুষের, আরও ভাল জীবন। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীদের সার-কীটনাশক বেচে বিশাল লাভ, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, সরকারী আমলাতান্ত্রিকতা, কৃষককে ধার দিয়ে বেঁধে ফেলা, সামাজিক সামগ্রিক ক্ষতি করে কোথাও কোথাও ধনী চাষির লাভ।

অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রযুক্তিও সব একরকম নয়। কর্তৃত্বকারি গোষ্ঠী তাদের লাভের জন্য যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বানাবে, তার উল্টো দিকে থাকবে মানবিকতা-ভিত্তিক আরেক বিজ্ঞান প্রযুক্তি। অস্বচ্ছ হলেও তার চেহারাটা বলিরাজা বাঁধের মধ্য দিয়ে হয়ত দেখা যায় তার পরিবেশ বাঁচানোয়, তার ভৌগোলিকভাবে উপযোগী চাষবাসের পরিকল্পনায়, তার স্থানীয় ও সমতা ভিত্তিক ভাগ-বাঁটোয়ারায়।

9.10. ব্রাহ্মণ্য লোককথা অনুযায়ী বলিরাজা এক নিষ্ঠুর দৈত্য। বিষ্ণু তাঁর বামন অবতারে উদ্ধত বলিরাজাকে পায়ের চাপে মাটিতে মিশিয়ে দেন। অন্যদিকে কৃষিজীবি সাধারণ গ্রামের মানুষদের লোককথা অনুযায়ী বলিরাজা ছিলেন আদর্শ এক দরদী, কৃষক রাজা। কেরালার 'ওনাম' উৎসব তাঁকেই ঘিরে। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে—"কৃষকের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ঘুচে যাক্—বলিরাজার রাজত্ব ফিরে আসুক"। সত্যি তো, বলিরাজাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে !

কিন্তু আজ যেভাবে সমাজের একেবারে নীচের তলা থেকে উঠে আসছে আন্দোলন, মনে হয় ভারতের মাটির থেকে বলিরাজাদের উঠে আসাকে আটকানো হয়ত খুবই শক্ত হবে !

10. যে লেখাগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়েছে

1 গেল্ ওমভেট্ : Of Sand and King Bali ; Economic & Political Weekly (EPW), Feb 28, '87.

2 মহেশ ভিজয়পুরকার : For a people's dam ; Frontline, Oct 31—Nov 13, '87.

3 কে এল জয় ও নাগামানি রাও : The great sand robbery & impending ecological disaster ; EPW, Aug 13, '88.

4 অনন্ত আর এস্ ফাড়কে : A people's dam ; EPW, Apr 22, '89.

5 ভারত পাটানকর : Bali Raja Smruti Dharan ; Frontier, Apr 14, '90.

6 Call to halt Sangli sand auction ; Times of India ; May 4, '90.

7 মিনা মেনন ; Sangli villagers oppose quarrying ; Times of India, Jun 1, '90.

8 অনন্ত আর এস ফাড়কে : Baliraja mini dam—unfinished struggle ; EPW, Jun 30, '90.

9 শ্রমিক মুক্তি দলের দলিল

01 গোপাল গুরু : Western Maharashtra—peasant and politics ; Frontier, Sep 22—Oct 6, '90.

11 কে এল জয় : Bali Raja Smruthi Dharan : The people's dream. An alternate path to development. Feb, '91.

[জয় 'মুক্তি সংঘর্ষ' আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। বি ও বি-র জন্য তথ্যসমৃদ্ধ এই লেখা পাঠানোয় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ]

—তিলক মুখোপাধ্যায়

পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতার জনজীবন ও ঐতিহ্যের চলমান সাথী

ছন্দিত অতীত-স্পন্দিত বর্তমানের শহর কলকাতা। যুগের সন্ধিলগ্নে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যার অভ্যুদয়; সম্ভাবনাময় আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপর যার বিকাশ। কলকাতার বর্ণময় জীবনধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত আর একটি নাম-পূর্ব রেলওয়ে।

১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট। সকাল সাড়ে আটটায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের প্রথম বাষ্প ইঞ্জিন চালিত ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন ছেড়ে ৯১ মিনিটে পৌঁছয় হুগলী।

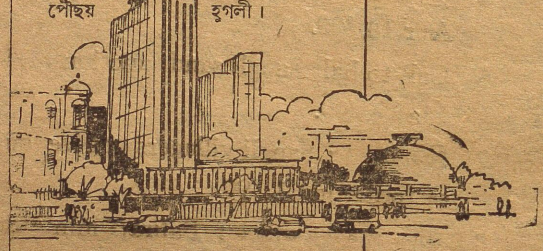

১৮৫৫ -র ৩রা ফেব্রুয়ারী থেকে নিয়মিত যাত্রীপরিবহনের মধ্য দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু...

তারপর, কলকাতা বড় হতে হতে পরিণত হয়েছে এক বিশাল মহানগরীতে যার সংস্কৃতি স্বকীয়তায় সমৃদ্ধ... যেখানে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও আছে আনন্দ। উদার-হৃদয় এই শহরের প্রতীক-কলকাতার একান্ত আপন পূর্ব রেলওয়ে। প্রতিদিন লাখো নিত্যযাত্রীর সেবায় নিয়োজিত এক প্রতিষ্ঠান-যা অবিরাম উন্নয়নের মাধ্যমে তাল মিলিয়ে চলেছে কলকাতার বহুমুখী বিকাশের সাথে। চলছে ডিজেল ও ইলেকট্রিক ট্রেন। আধুনিকীকরণ হচ্ছে লাইন ও লোকোমোটিভের। প্রবর্তিত হয়েছে উন্নত যোগাযোগ ও কম্পিউটার ব্যবস্থা-এমন কি যুক্ত হয়েছে চক্ররেলও।

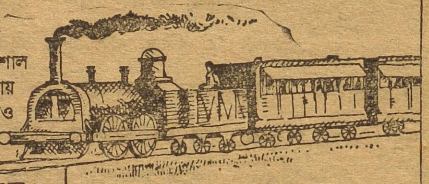

কলকাতার সাথে সমগ্র ভারতের যোগসূত্র পূর্ব রেলওয়ে। কলকাতা ও পূর্ব রেলওয়ে

-অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে-যাওয়া দুই অন্তরঙ্গ অবিচ্ছেদ্য সহযাত্রী।

পূর্ব রেলওয়ে

naa ER 8906

কামানি টিউবস্ ঃ বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের মোকাবিলায় একটি পদক্ষেপ

[এই শতকের '80-র দশক ভারতীয় শ্রমিকের জীবনে এক বন্ধ্যা সময় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন ও তাদের সহযোগীরা সরকারকে বলছে রুগ্ন ও বন্ধ শিল্পগুলো তোমরা নিয়ে চালাও। বছর কুড়ি আগে এ দাবী ছিল যথেষ্ট জনপ্রিয় কিন্তু '80-র দশকে দেশ ও বিদেশের অর্থনীতি আর রাজনীতির জগতে যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলে এ কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর জাতীয়করণের ফল ? 120টা সুতোকল নিয়ে তৈরী ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের নড়বড়ে অবস্থা একটা উদাহরণ হিসেবে ভালই কাজ করতে পারে। পাশাপাশি এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে '80 সালে সমগ্র দেশে যেখানে বন্ধ ও রুগ্ন শিল্প ছিল মোট 25,000 সেখানে '90 সালের আগস্ট মাসে তা এসে দাঁড়িয়েছে 2,69,000-এ। প্রতিবছর গড়ে 27,000 কারখানা রুগ্নতার পথে পা বাড়াচ্ছে।

এই রকম একটা ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের দেশে সর্বপ্রথম '88 সালের 19 সেপ্টেঃ বোম্বাই-এর কামানি টিউবস্ লিমিটেড কারখানাটি ওই কারখানারই শ্রমিকরা হাতে তুলে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এ হল এক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ইংল্যাণ্ডের বায়ুযানের যন্ত্রাংশ-সংক্রান্ত কারখানা 'লুকাস এয়ারোস্পেস' প্রতিষ্ঠানটি যখন সেখানকার শ্রমিক-সমবায় দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে নিজেদের হাতে তুলে নেয়, বহু দূর কলকাতার ছোট্ট পত্রিকা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী সে খবর তার পাতায় ছাপিয়েছিল। কারণ লুকাস শ্রমিকরা গণবিজ্ঞান প্রয়াসগুলির একটি প্রায় অবহেলিত দিককে তুলে ধরেছিলেন। তা হল সুযোগ পেলে সাধারণ মানুষরাও কারখানা মালিক, বড় ইঞ্জিনিয়ার, আমলাদের কাজগুলো বদলে ফেলে মানবিক ভাবে নিজেরাই গড়ে তুলতে পারেন উঁচু মানের এক সমবায় ভিত্তিক কারখানা সংগঠন।

কামানি টিউবস্ এর শ্রমিকদের প্রয়াসের সাথে কোথাও এর একটা মিল আছে, যদিও এখনও কামানি শ্রমিকরা লুকাস শ্রমিকদের মত উৎপাদন বদলানোর পথে যান নি। প্রশ্ন আছে, হয়ত সমালোচনা-সন্দেহও আছে। তবু আমাদের মনে পড়ে যায় লুকাস শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মাইক কুলি যে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর চারপাশে তিনি একটিও সাধারণ লোক দেখেন নি! শ্রমিকদের মধ্যেকার শক্তি, গড়ে তোলার ইচ্ছে এবং বন্ধুত্ব-সহযোগিতার এ হল এক স্বীকৃতি। আশা করা যায় কামানি টিউবস্-এর শ্রমিকরা ও তাঁদের ইউনিয়ন নিজেদের এই স্বীকৃতির যোগ্য প্রমাণ করবেন। বহু দূর অবধি ছড়িয়ে পড়া আমাদের উপ-মহাদেশের বন্ধ আর রুগ্ন, কল-কারখানার মানচিত্রে তা হলে কামানি টিউবস্ হয়ে উঠবে এক উজ্জ্বল বিন্দু। —স. ম.]

গোড়ার কথা ঃ প্রায় চার বছর উৎপাদন বন্ধ থাকার পর '89 সালের 18ই মার্চ কামানি টিউবস্ লিমিটেড কারখানা থেকে প্রথম যে রডটি তৈরী হয়ে বেরিয়ে এল তা কোনও সাধারণ ধাতুর টুকরো ছিল না। এটা তৈরী করেছিল এমন এক কারখানা যার মালিক হল শ্রমিকরাই।

এক সিন্ধি পরিবার 'কামানি'দের মালিকানাধীন 'কামানি টিউবস্'এর ইতিহাস শুরু হয়েছিল '60 সালে। বোম্বাই-এর কুরলা অঞ্চলে অবস্থিত এই সংস্থার উৎপাদন হল লোহা বাদে অন্য ধাতুর (পিতল, তামা ইত্যাদি) তৈরি বিশেষ ধরণের টিউব ও রড। চিনি, সার, জাহাজ, ট্রাক, রেফ্রিজারেটর ও প্রতিরক্ষা শিল্পে দারুণ বাজার ছিল কামানি টিউবের (গোটা বাজারের প্রায় 60%)। '70-এর দশকের একদম শুরুতে লাভের দিকেই ঝুঁকে ছিল কোম্পানিটি। মনে রাখা দরকার যে কামানি ও তাদের আত্মীয় বিনানি পরিবার, ভারতের অ-লৌহ ধাতুর বাজার দখলে রেখেছিল 40 বছর ধরে।

কিন্তু পরিবারের মধ্যেকার রেষারেষি, বিবাদ, লোভ, এবং প্রতিযোগিতামূলক চুরির ফলে সংস্থা হল রুগ্ন।

'72 সালে সংস্থার নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন আর আর কামানি যাঁকে কামানি পরিবারের অন্যান্যরা মানতে রাজি ছিলো না। অব্যবস্থা উঠল চরমে। কামানি টিউবস্-এর ইউনিয়ন কে ই ইউ (কামানি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন) '75-এ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো এক আর্জিতে বলে যে কামানি টিউবস্ বিপন্ন—কারণ কামানিরা চুরি করছে। আর প্রমাণ সহ দেখাল যে কামানিরা (1) মাল কেনার সময়ে বাজারের চেয়ে বেশী দাম দিচ্ছে। (2) বেশী করে স্ক্র্যাপ দেখাচ্ছে (3) অস্বাভাবিক বেশী হারে গলানি লোকসান (Melt Loss) দেখাচ্ছে। (4) উঁচুমানের মালকে নীচু ছাপ দিয়ে কম দামে বেচছে। (5) খরচ ফাঁপিয়ে টাকা সরাচ্ছে, ফলে যদিও বিক্রি বাড়ছিল, মুনাফা কমতে কমতে হয়ে গেছে 'লোকসান'। (6) এছাড়া কামানিরা স্টক ও অন্যান্য সম্পদের মূল্য ফাঁপিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে দেদার টাকা সরাচ্ছে।

কামানিদের মালিকানাধীন অন্যান্য সংস্থাতেও এসবের ছাপ পড়ছিল। দুটো কোম্পানি কামানি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন আর জয়পুর মেটাল, পরিবারের হাতছাড়া হয়ে গেল। সুস্থ উৎপাদনের বিরুদ্ধে যাওয়ার এক নজির দেখিয়ে '77 সালে কামানি টিউবস্ গুটিয়ে ফেলার জন্য কামানিরাই খাড়া করল এক মামলা। কোম্পানির অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হচ্ছে দেখে কে ই উ চালাতে লাগল চিঠি, টেলিগ্রাম, ধর্ণা, মিছিল।

এপ্রিল, '79 তে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করল। ব্যাঙ্কের কাছে, তদ্দিনে দেনা 5 কোটি টাকা। অক্টোবর, '79 তে কে ই-

ইউ দাবি করল রাজ্য সরকারকে নিয়ে নিতে হবে কামানি টিউবস্। চালাল অনশন ধর্মঘট। '80র ফেব্রুয়ারিতে রাজ্য পর্যায়ের এক বৈঠকে প্রস্তাব এল কামানিদের এক লাখ শেয়ার গচ্ছিত রাখা হোক। পাশাপাশি সরকারি গ্যারান্টির ভিত্তিতে কাজ চলুক। কামানিরা কিন্তু এ দাবি মানল না। কে ই ইউ গেল কেন্দ্র স্তরে। '80 সালের জুন মাসে কেন্দ্র আই ডি বি আইকে (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া) বলল কোম্পানীর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে। জুলাই মাসে আই ডি বি আই তার রিপোর্টে বলল কামানি টিউবস্ লাভ করার ক্ষমতা রাখে এবং সরকারের উচিত এটা নিয়ে চালানো।

এই সময়ের মধ্যেই ব্যাঙ্ক তার সমস্ত সুযোগ সুবিধে তুলে নিতে চাইল এবং কোম্পানীর বিরুদ্ধে মামলা করল। কিন্তু মহারাষ্ট্র সরকারের শিল্প সচিব '80 সালের এপ্রিল মাসে মধ্যস্থতা করলেন এবং কানাড়া ব্যাঙ্ককে রাজী করালেন 50 লাখ টাকা দিতে যাতে কারখানার দৈনন্দিন উৎপাদনের খরচ চালানো যায়। কামানিরা এ টাকা নিতে চায় নি কিন্তু কে ই ইউ উৎপাদন ও সরবরাহের ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখে কানাড়া ব্যাঙ্ককে বোঝাল যে এই টাকা দিয়ে অস্থায়ীভাবে কোম্পানী চলতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম একটি সরকারী ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের কথায় কোম্পানীকে টাকা দিল। ফলে '82তে কামানি টিউবস্ লাভ করলো 28 লাখ টাকা। '82-র শেষে কামানি টিউবস্-এর উন্নতিকল্পে রাজ্য সরকার এক প্রস্তাব দিল। '83র সেপ্টেম্বরে ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াও এ ধরনের একটি পরিকল্পনা দাখিল করল। কামানিরা এসব প্রস্তাবে রাজী হল না। '83 সালের 4ঠা অক্টোবর কোম্পানীতে লক আউট ঘোষণা করল। বহু টালবাহানার পর '84 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক ও ইউনিয়নের দাবি মেনে নিয়ে কামানিরা কারখানা খুলতে বাধ্য হল। পাশাপাশি টাকা সরানোর হারও বেড়ে গেল রাতারাতি। পরিণতিতে উৎপাদন আটকে গেল '85-র সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। অথচ কোন আইনী ক্লোজার বা লক্ আউট ঘোষণা করা হল না। ন'মাসের মাইনে না পাওয়া শ্রমিকরা দেখলেন কারখানার জল ও আলো সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

কে ই ইউ সুপ্রিম কোর্টে গেল 20শে এপ্রিল, '86তে। বলল 'আমরা 14 মাস মজুরী পাইনি। বাঁচার মৌলিক অধিকার চাই।' বস্তুত কে ই-ইউর লক্ষ্য ছিল একটাই। তা হল—'কারখানা চলুক এবং শ্রমিকরা যেন তাদের মজুরী পায়।' রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিগ্রহণ খুবই কাম্য ছিল। কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথম ইউনিয়নের শ্রমিক সমবায় গড়ে কারখানা চালানোর কথা সামনে এল।

নতুন পথে যাত্রা শুরু ঃ মনে রাখতে হবে যে কামানিদের অপদার্থতা ও লুণ্ঠনের ঘটনা প্রকাশ করে দেওয়া থেকে শুরু করে ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য সরকারী কর্তৃপক্ষকে কারখানার নানান বিষয় বোঝাতে গিয়ে কে ই ইউকে শ্রমিকদের সাথে নিয়ে জানতে হয়েছে, খাটতে হয়েছে প্রচুর। ফলে কোম্পানি চালানর বিকল্প রাস্তা সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠছিল অনেক দিন ধরেই। কিন্তু '86 সালের জানুয়ারী মাসে 'সিক ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কোম্পানিস্, (স্পেশাল প্রভিসনস্) অ্যাক্ট, (সিকা) 1985 পাশ হওয়া, তাঁদের আইনী বৈধতা এনে দিল। কারণ এই আইনে শ্রমিক-সমবায়ের কারখানা চালানর স্বীকৃতি ছিল। পাশাপাশি এই আইনের আওতায় গড়ে উঠল বি আই এফ আর (বোর্ড ফর ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাণ্ড ফাইনান্সিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন)। এই সংস্থাটির উপর কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব দিল রুগ্ন শিল্পর ভবিষ্যত ঠিক করার। এবং বলা হল সিকা আইনে শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের তেমন কোন ভূমিকা দেওয়া নেই, কোম্পানি রুগ্ন হলে সংশ্লিষ্ট সবাইকে বি আই এফ আরের কাছেই যেতে হবে।

এই পরিস্থিতিতে কে ই ইউ নানান পেশাদার ও প্রযুক্তিবিদ, ফাইনান্স ও মার্কেটিং বিশারদদের সাথে আলোচনা চালায়। এবং পাশাপাশি সমস্ত শ্রমিকদের নিয়ে এক সাধারণ সভা আহ্বান করে। এতে প্রায় 400 শ্রমিক অংশ গ্রহণ করেন। খোলাখুলি বহু আলোচনা হয়। এক সপ্তাহ ধরে নানান বিষয়ে বিতর্ক চালানর পর সাধারণ সভা 'শ্রমিক-সমবায়' গড়ে তোলার পক্ষে মত দেন। যে চারটি বিষয় এক্ষেত্রে জোর প্রায় সেগুলি হল (1) বাজার ঃ কামানি শ্রমিকরা পেশাদারী মার্কেট সার্ভের বদলে কিছু সহানুভূতিশীল ও এই বিষয়ে উদ্যোগী ব্যক্তির কাছে সাহায্য চান। তাঁরা জানতে পারেন যে অন্য কোম্পানী তাঁদের নামে বাজারে নীচু মানের মাল চালাচ্ছে। এবং মালের যোগানও অনিয়মিত। (2) কারখানার অবস্থা (যন্ত্রপাতি) খতিয়ে দেখা ঃ এ ব্যাপারে তাঁরা কামানিতে কাজ করেছেন এরকম এক সহানুভূতিশীল উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ও পাশাপাশি দক্ষ প্রযুক্তি-বিদদেরও সাহায্য নেন। (3) পেশাদারী ও প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা, প্ল্যাণ্ট চালানর জন্যে ঃ কামানির পুরোন পেশাদার ও বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন, কে ই ইউ পাশাপাশি এ কথাও বলে যে মালিকরা যদি বিশেষজ্ঞ ভাড়া করতে পারে তো আমরাও করব। (4) তহবিল তৈরী করা ঃ প্রাথমিক ধারণা ছিল শ্রমিকরা তাঁদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে 10 লক্ষ টাকা তুলবেন। এর ওপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার দেবে 30 লক্ষ টাকা। এই মোট 40 লক্ষ টাকার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা কাজ চালানোর মত পুজি অর্থাৎ 4 কোটি টাকা পাবেন সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে সমবায়ের জন্য।

জিতল শ্রমিক-সমবায় ঃ '86 সালের 12ই সেপ্টেঃ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমিক-সমবায় গড়ার কথা ঘোষণা করা হল। আর 1লা অক্টোঃ সত্যিসত্যিই সেটা গড়ে উঠল। প্রথম তিন মাস সব কিছুই ছিল অনিশ্চিত। ব্যাঙ্ক, সমবায় অধিকারক সবাই এদের বিরোধিতা করে। পাশাপাশি ইউনিয়ন কর্মীরাও পুরো ছবিটা বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

এখানে প্রাসঙ্গিক এক তথ্য হল সুপ্রীম কোর্ট, বিচারক এ সি গুপ্তাকে কামানি পরিবারের মধ্যেকার বিবাদ মেটানর জন্য মধ্যস্থ দাঁড় করিয়েছিল অনেক আগেই। পরে কামানি শ্রমিকদের বাঁচার অধিকার নিয়ে কে ই ইউ যখন সুপ্রীম কোর্টে যায় (20শে এপ্রিল '86) তখন এ ব্যাপারেও সুপ্রীম কোর্ট ওই একই ব্যক্তিকে মধ্যস্থ নিযুক্ত করে। 2রা জুলাই বিচারক গুপ্তা, কামানি পরিবারের ধরে রাখা কামানি টিউবস-এর 90% শেয়ার ছেড়ে

দেওয়ার জন্য কামানিদের নির্দেশ দেন। কোন ক্রেতা যখন ছ মাসেও এগিয়ে এল না তখন 22শে জানুয়ারী, '87 শ্রমিকরা সুপ্রীম কোর্টকে অনুরোধ করল সমবায়কে সমস্ত শেয়ার হস্তান্তরিত করা হোক এবং তাদের পেশ করা পরিকল্পনা বিবেচনা করে দেখা হোক। সুপ্রীম কোর্ট বি আই এফ আরকে বলে আই ডি বি আই-এর মাধ্যমে এই প্রস্তাব যাচাই করতে। আই ডি বি আই-এর প্রশংসাসূচক রিপোর্ট, আশিষ কামানির পালটা প্রস্তাব এবং কামানিদের সামগ্রিক বিরোধিতা সব কিছুর মধ্য দিয়ে বি আই এফ আর শ্রমিক সমবায়ের পক্ষে তার সিদ্ধান্ত সুপ্রীম কোর্টকে জানাল '88 সালের 14ই সেপ্টেম্বর, আর তারপরই এল সেই ঐতিহাসিক রায়, যাতে সুপ্রীম কোর্ট কামানি টিউবস্ কারখানা তুলে দিল শ্রমিক-সমবায়ের হাতে।

প্রস্তাবের কয়েকটি দিক: (1) কামানিদের 93% শেয়ার শ্রমিক-সমবায়কে '10 টাকার শেয়ার সমান 1 টাকা' হিসেবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ 96 লক্ষ টাকার শেয়ারের দাম হবে 9·6 লক্ষ টাকা। (2) কামানি টিউবস্ পরিচালনা করবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস। তাতে থাকবে বি আই এফ আয়ের 1জন, মহারাষ্ট্র সরকারের 2জন, ব্যাঙ্কের 1 জন, 3জন বিশেষজ্ঞ এবং 2জন শ্রমিক প্রতিনিধি। (3) উৎপাদনের ক্ষেত্রে দু ধাপের পরিকল্পনা নেওয়া হবে, প্রথম ধাপে যন্ত্রপাতি চালু করে 'না লাভ না লোকসান' স্তরে উঠতে হবে 6-7 মাসে। দ্বিতীয় ধাপে নেওয়া হবে আধুনিকীকরণের কর্মসূচী। রেফ্রিজারেশন শিল্পের জন্য কিউপ্রো-নিকেল মাল বানান হবে। বিদ্যুৎ প্রকল্প পেট্রোলিয়াম শিল্প এবং জাহাজ শিল্পকে মাল দেওয়া হবে। উৎপাদনের তৃতীয় বছরে কোম্পানী লাভ করবে 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা। 7 বছরের মাথায় কোম্পানি লোকসান মুছে ধার শোধ দেবে এবং চলতি পুঁজি হিসেবে ব্যাঙ্ক'কে 1 কোটি টাকা দেবে। (4) শ্রমিক কর্মচারী: (ক) অবসরের কাছাকাছি পৌছন 60-70জন অবসর নেবেন। (খ) প্রথমে 600 জনকে নেওয়া হবে। বাকিদের (দেড়শর কাছাকাছি) আস্তে আস্তে ফেরত নেওয়া হবে। (গ) 3 বছর বেতন বৃদ্ধি বন্ধ থাকবে। (ঘ) মজুরীর 75 ভাগ প্রথম বছরে এবং 85 ভাগ দ্বিতীয় বছরে দেওয়া হবে। (ঙ) 1/1/86 থেকে কোন পুরোন মজুরী দাবি করা হবে না। (চ) লাভের 20% শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। (ছ) আগামী 3 বছর কোন স্ট্রাইক, গো স্লো ইত্যাদি হবে না। (জ) প্ল্যান্ট লেভেল্ কমিটি হবে শ্রমিক ও অফিসারদের নিয়ে কারখানার রোজকার কাজ চালানর জন্য, ইত্যাদি।

ইউনিয়নের ভূমিকা: কে ই ইউ-এর ভূমিকা শ্রমিক-সমবায় তৈরীর ক্ষেত্রে বিরাট মাপের। সাথে সাথে সিকা আইন এবং তার আওতায় বি আই এফ আর গঠনও (বি আই এফ আরের ভূমিকাও সব ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত নয়। কারখানা বন্ধ করে দিতে পারে বি আই এফ আর সহজেই, কিন্তু শ্রমিকদের হাতে কারখানা তুলে দেওয়ার পথে রয়েছে অনেক বাধা) এক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কে ই ইউ কর্মীরা নিজেদের দক্ষতা বাড়িয়েছেন নানান পথে। ব্যালান্স্ শীটের ফাঁকফোকর দেখতে শিখেছেন তাঁরা। বিশেষজ্ঞদের সাহায্য যেখানে যতটা সম্ভব নিয়েছেন। সর্বোপরি সাধারণ শ্রমিকদের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ রেখে গেছেন। তাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন, তাঁদের শিখিয়েছেন, সবকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করেছেন গণতান্ত্রিকভাবে। এর চরম উদাহরণ দেখা যায় যখন শ্রমিকরা কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অন্য এক ইউনিয়নের ডাকে সাড়া দিয়ে কে ই ইউকে সরে যেতে বলেন। কে ই ইউ তৎক্ষণাৎ তাঁদের মতামতকে সম্মান জানিয়ে কারখানা ছেড়ে চলে যায় এবং যতদিন না শ্রমিকরাই তাঁদের ফিরিয়ে আনেন ততদিন তাঁরা আর ফিরে আসেন না। এই গণতান্ত্রিকতাই তাঁদের সাফল্যের এক বড় উপাদান। অন্যদিকে পরিকল্পনা তৈরী করার ক্ষেত্রে তাঁদের নিরলস পরিশ্রম কি আইনজীবি, কি বি আই এফ আরের অফিসার—প্রত্যেকেরই প্রশংসা পেয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইউনিয়ন তথা সমবায়ে গণতান্ত্রিকতা ঠিক রাখার জন্য শ্রমিকদের শিক্ষা ও অংশগ্রহণের পাশাপাশি কে ই ইউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোন পদেই কোন ব্যক্তি একটানা দু বছরের বেশী থাকতে পারবে না।

অনাহারের দিন শেষ: কামানি টিউবস্ বেআইনীভাবে বন্ধ করে দেওয়া শ্রমিক পরিবারে ডেকে এনেছিল কালো দিন। অনাহার, টাকার অভাবে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, মেয়ের বিয়ে দিতে না পারা এমন কি তিন শ্রমিকের আত্মহত্যা, কুরলার শ্রমিক এলাকায় ফেলেছিল এক অশুভ ছায়া। আজ কিন্তু অবস্থাটা বদলাচ্ছে। সমবায়, কারখানার দখল পেয়ে প্রথম যে কাজ করেছিল তা হল কারখানাকে ঝকঝকে তকতকে করে তোলা। আসলে চেষ্টাটা বোধহয় ছিল এক নতুন দিন শুরু করবার। তাই নিজেদের কারখানাকে রঙ করে নতুন করে তুলতে চেয়েছেন শ্রমিকরা। এই পরিবর্তনের প্রমাণ রয়েছে দুর্ঘটনার হারে। সেটি নেমে এসেছে শূন্যে। দূষণ কমেছে। যে লক্ষ্য তৈরী করেছিলেন পরিকল্পনা রচয়িতারা, বাস্তব অনেকটা সেইদিকেই চলছে।

শেষ কথা: কামানি টিউবস-এর ঘটনা নানান প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে। কয়েকজন ইউনিয়ন নেতার কারখানার পরিচালনায় অংশগ্রহণকে শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ বলা যায় কি না, সে প্রশ্ন তো আছেই। আর কে ই ইউ তো বেতন না বাড়ানো, কিছু লোক ছাঁটাই এসব আপাতত মেনেই নিয়েছে। এসব সমস্যার কোন সমাধান তাঁরা করবেন? শ্রমিক মালিকানায় শ্রমিকদের মধ্যেই অন্যদের উপর কর্তৃত্ব করার প্রবণতা জেগে উঠলে তাকে কি করে আটকান হবে? সাধারণ শ্রমিক কি বিশেষজ্ঞর সমান মর্যাদা পাবেন? এ সব নানান প্রশ্নের উত্তর কামানি টিউবস কেমনভাবে দেয় সেদিকেই চেয়ে আছে অন্য সব রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকরা আর তাদের ইউনিয়ন।

[এই সংকলনটি লেখা হয়েছে যে সব রিপোর্ট থেকে: (1) দ্য টেক ওভার—'দ্য সোসাইটি ফর পার্টিসিপেটারি রিসার্চ ইন এশিয়া' দ্বারা প্রকাশিত পুস্তিকা। (2) কামানি টিউবের ইতিকথা—নাগরিক মঞ্চ, 134, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলি-85, রুম নং 7। (3) নাগরিক মঞ্চ বুলেটিন 9-10, নভেম্বর '90]। —**সুজয়, সুরঞ্জন**

প্রতিবেদন—

'একটি গাছ একটি প্রাণ'—কোলাঘাটে গণ-আন্দোলন

23শে ফেব্রুয়ারী, '91। সন্ধ্যে ছ-টা। কোলাঘাট স্টেশনে নেমে এক ভদ্রলোককে বললাম—'কোলাঘাট জৈনভবনে যাব, একটু দেখিয়ে দেবেন?' আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই তিনি বললেন—'আসুন আসুন, কন্‌ভেনশানে যাবেন তো? আপনি নিশ্চয়ই বি ও বি থেকে আসছেন—আমরা কাল খবর পেয়েছি। জানেন, অনিত-কে ওরা শুধু শুধু মারলো। অনিত-তো কোনও দোষ করেনি, শুধু একটা গাছ বাঁচাতে চেয়েছিল। আর অনিতকে যারা মারলো তারা দিনের আলোয় প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

জৈনভবনে, নানান কথাবার্তার মধ্য দিয়ে উপস্থিত বিভিন্ন সমাজ সেবী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা সকলেই স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনলেন। অনেকেই এর পিছনে কোনও এক অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিত দিলেন। উপস্থিত অনেকের মতোই এই প্রতিবেদকের কাছে স্থানীয় প্রশাসনের এই আচরণ বিস্ময়কর! কারণ স্থানীয় মন্ত্রী, এম এল এ, পঞ্চায়েত সবাই বিজ্ঞান ও সমাজকর্মী অনিত দাসের উপর আক্রমণকারী সমাজবিরোধীদের উপযুক্ত শাস্তি দাবী করেছেন।

এবার আসল ঘটনায় ফেরা যাক। মার্চ, '90। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এক বিভ্রান্তিকর টেণ্ডারের মাধ্যমে পাইকপাড়ী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সম্মুখে, স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাকালের স্মারক হিসাবে চিহ্নিত একটি ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ কাটার উদ্যোগ নেন। এর বিরুদ্ধে 'কোলাঘাট-সায়েন্স-হবি-সেণ্টার' তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। হবি সেণ্টার-এর সভাপতি অনিত দাস সেই আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ফলশ্রুতি হিসেবে হাইকোর্টে কেস হয়। এবং 26শে এপ্রিল, '90 তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট-এর রায়ে গাছটির প্রাণ রক্ষা পায়।

এর পরের ঘটনা 25শে জানুয়ারী, '91। আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রে পুনরায় গাছটি কাটার ষড়যন্ত্র হয়। অনিত দাস ও অন্যান্য বিজ্ঞান ও সমাজকর্মীদের তৎপরতায় সেই ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হয়।

এর ফলে সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষী মহল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। 27 তারিখ তার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পাইকপাড়ী পুলের কাছে পাঁচজন সমাজ-বিরোধী প্রকাশ্য রাস্তায় সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টা নাগাদ লাঠি, ছুরি, রড ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র দিয়ে অনিত দাসের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায় ও তার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।

গুরুতর আহত অবস্থায় অনিত দাসকে পাইকপাড়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে সেখান থেকে তাঁকে উলুবেড়িয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে 48 ঘণ্টা থাকার পর অনিত দাসের শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতির ফলে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

এর পরের ঘটনা এখন ইতিহাস। একটি গাছকে কেন্দ্র ক'রে কোলাঘাটে শুরু হয়েছে ব্যাপক গণ আন্দোলন। দলমত নির্বিশেষে কোলাঘাটের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অনিত দাসের উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণের প্রতিবাদে মুখর। কোলাঘাট ও সন্নিহিত অঞ্চলের 53টি সমাজ, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞান ও গণসংগঠন, সমস্ত রাজনৈতিক দল, চিকিৎসক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র, কৃষক, মহিলা সবাই আজ এক মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন। পোস্টার, লিফলেট, ডেপুটেশন, কন্‌ভেনশন, গণমিছিল-এর মাধ্যমে সামিল হয়েছেন গণবিজ্ঞান আন্দোলনে। কোলাঘাটে বৃক্ষ তথা পরিবেশ রক্ষার যে আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনে অনিত দাসের যে ভূমিকা এই রাজ্যে পরিবেশ আন্দোলনে তা নিশ্চয়ই নতুন মাত্রা যোগ করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

—নিশীথ চৌধুরী

বিকল্পের সন্ধানে যাত্রা—মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রতিনিয়ত প্রবহমান। যা কিছু প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত, তার মধ্যেই সংকটের রূপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয় বিজ্ঞানের নিয়মেই। এ কোনও নিয়তিবাদ নয়। এই মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রাণ-অপ্রাণ বস্তু-সমূহে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল তার আভ্যন্তরীন কারণ সমূহের জন্যই—অন্য বস্তু সমূহের সাথে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অনুঘটকের কাজ করে মাত্র। যা সে এখন, তাকে ত্যাগ করে নতুন কিছু হওয়াই প্রতিটি গতিশীল সত্তার একমাত্র লক্ষ্য। সে চায় নতুন কিছু হতে—কিন্তু সেতো জানেনা সে কি হবে। তাই সে প্রতিনিয়ত সন্ধানে ব্যস্ত—বিকল্পের সন্ধানে। আজকে যা প্যারাডাইম, তার মাঝেই রয়েছে আগামীর গঠন।

—অভিনন্দন সহ

এইডস ঃ তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও সরকারী ভূমিকা

দিল্লীতে শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কিছু সমাজকর্মী একদিকে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর (কম্যুনিটি) মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইন-সংক্রান্ত বিষয়, অন্যদিকে নারী ও সমকামীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। সেই সূত্রে আজ থেকে প্রায় বছর দুই আগে দিল্লীর জি বি রোডে রেড-লাইট এলাকার নারী দেহ-শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা ও নানান সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাঁরা তথাকথিত সভ্য দুনিয়াকে এর কিছুটা আভাস দেবার তাগিদ অনুভব করেন। তাঁরা কাজ শুরু করেন বেশ্যালয়ের ভেতরে এক ছোট্ট ডিসপেনসারি চালু করার মধ্যে দিয়ে যেখানে ছোট-খাটো রোগের চিকিৎসা এবং বিনা পয়সায় ওষুধ ও কনডোম বিলির বন্দোবস্ত ছিল। ক্রমে ঐ এলাকার নারী দেহ-শ্রমিকরাও এই ডিসপেন-সারির নানান কাজেকর্মে স্বেচ্ছায় জড়িত হন এবং নিজেদের সমস্যাগুলি জানাতে শুরু করেন। জানা যায়, এখানকার মহিলাদের শ'য়ে শ'য়ে জোর করে নিয়ে যাওয়া হয় কী-একরকম রোগের পরীক্ষার জন্য—যেটা পরে বোঝা যায় এইডস। কর্মীরা আরো জানতে পারেন যে এই পরীক্ষা চালাচ্ছিল অল ইণ্ডিয়া ইনসস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস) এবং ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আই সি এম আর), পুলিসের সক্রিয় সহযোগিতায়। ঠিক এই সময়তেই (আগস্ট '89) পার্লামেণ্টে আনা হয় 'এইডস বিল'—জোর জবরদস্তি পরীক্ষা করার সবরকম ধারা সমেত। 9ই আগস্ট এই বিল প্রত্যাহার করার আবেদন জানানো হয় রাজ্যসভায়। 12ই অক্টোবর '89-তে এই কর্মীরা 'জয়েণ্ট উইমেনস প্রোগ্রাম' (জে ডব্লিউ পি)-এর সাহায্যে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। এই বছরই 12ই ডিসেম্বর জে ডব্লিউ পি আয়োজন করে একটি ওয়ার্কশপের। বিষয় 'এইডস ও নারী দেহ-শ্রম'। এই ওয়ার্কশপে এবং 28শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে সরকারের জনবিরোধী এইডস নীতির প্রতিবাদ ধরণাতেও জি বি রোডের নারীরা অংশগ্রহণ করেন। এরপর থেকেই বিভিন্ন আন্দোলনে এই নারী শ্রমিকরা সক্রিয় ভূমিকা নেন। যার ফলশ্রুতিতে সম্ভবতঃ আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রথম, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের 'নারী দেহ-শ্রমিক ও তাদের সন্তান-বিষয়ক' এক জাতীয় ওয়ার্কশপে জি বি রোডের পাঁচজন মহিলাকে সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে তাঁরা মতপ্রকাশ করেন যে সরকারী পুনর্বাসন তখনই কার্যকরী হবে যখন এই সমস্ত নারীদের সুস্থ জীবিকা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

জি বি রোডের সমাজকর্মীরা এইডস-আক্রান্ত মানুষ, চিকিৎসক, প্রশাসন তথা অন্যান্য নানান দিকের মতামত ও তথ্যের বিশ্লেষণে এই উপলব্ধে পৌঁছেছেন যে এইডস সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সমাজের প্রান্তদেশে অবস্থিত নারী দেহ-শ্রমিকদের এবং সামাজিক ভাবে ঘৃণিত অন্যান্য মানুষদের উপর এইডস-কেন্দ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক নিপীড়ন, চরম একপেশে আইন প্রণয়ন সব বিষয়েই আমাদের জানাটা বড়োই কম। তাই তাঁরা বন্ধুদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে প্রকাশ করেছেন, এক ছোট পুস্তিকা। নাম 'এইডস ও নারী—দোষারোপ এবং অস্বীকার' যাতে শুধু সমালোচনাই নয়—প্রাথমিকভাবে এই ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে কী করতে পারে সাধারণ মানুষ, কী করতে পারি আমরা—সে বিষয়েও বেশ কিছু কথা বলা আছে। আমাদের লেখাটি এই পুস্তিকারই এক ক্ষুদ্র, সংকলিত রূপ।

এইডস বনাম সরকারী প্রচার ঃ

'অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিন্ড্রোম' বা সংক্ষেপে 'এইডস' আজকের দুনিয়ার সামনে এক বড়ো মাপের স্বাস্থ্য তথা মানবাধিকার সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। জুন 1990-এর হিসেব অনুযায়ী 156টি দেশে 2,63,051টি এইডস রোগীর খবর পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে গোটা বিশ্বে এর দ্বারা সংক্রামিত মানুষের সংখ্যা আশি লক্ষ থেকে এক কোটী।

এইডস-এর জন্যে দায়ী ভাইরাস হল—হিউম্যান ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এইচ আই ভি) যার আক্রমণে রক্তের এক বিশেষ ধরণের শ্বেতকণিকা (হেল্পার টি সেলস্) সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে, শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, দেখা দেয় মারাত্মক রোগলক্ষণ যেমন—যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, এবং বিশেষ ধরণের ক্যান্সার (কাপোসির সারকোমা)। শেষ অবস্থায় মস্তিষ্কেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এইডস আক্রান্ত মানুষ।

এইডস নির্ণয় করার পদ্ধতিতেও অনেক গলদ আছে। রক্তের এলিজা (এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনো সরবাণ্ট অ্যাসে) পরীক্ষাকেই ধরা হয় এইচ আই ভি নির্ণয়ের মাপকাঠি হিসেবে। এটা আবার রক্তে এইচ আই ভির উপস্থিতির জানান দেয় এমনটা নয়—এইচ আই ভির জন্য রক্তে যে অ্যান্টিবডি (বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ যা দেহে তৈরী হয় কোনো অজানা বস্তুর উপস্থিতিতে—এক্ষেত্রে সেটা এইচ আই ভি) তৈরী হয় তার নিরূপক এই পরীক্ষা। আর কোনো এইচ আই ভি আক্রান্ত মানুষের

(এইচ আই ভি+) রক্তে এই অ্যান্টিবডি তৈরী হতে সময় নেয় কম করে ছ'সপ্তাহ থেকে তিন মাস, বা কোনো ক্ষেত্রে তিন বছর, কখনো বা আরো বেশী দিন। অর্থাৎ, কারুর এলিজা পরীক্ষায় কিছু পাওয়া গেল না মানে তার রক্তে এইচ আই ভি নেই এমনটা যেমন বলা যায় না তেমনই এইচ আই ভি আছে মানেই সে এইডস রোগী এমনটাও নয়। কারণ এলিজা পরীক্ষা পদ্ধতি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। বহু ক্ষেত্রেই এই পরীক্ষায় যারা এইচ আই ভি আক্রান্ত বলে ধরা হয়েছে, আরো উন্নত 'ওয়েস্টার্ণ ব্লট' (Western Blot) অ্যাসে পদ্ধতিতে দেখা গেছে তারা নীরোগ। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় ওয়েস্টার্ণ ব্লট পদ্ধতিতে এইচ আই ভি নির্ণয় করা সবসময়ে সম্ভব হয় না। নিয়ম হল দু'বার এলিজা ও একবার ওয়েস্টার্ণ ব্লট পরীক্ষা করতে হবে। এটা করা হয় না।

এইচ আই ভি+বেশীর ভাগ মানুষেরই বড় কোন রোগলক্ষণ দেখা যায় না। কিছু মানুষের ডায়ারিয়া, জ্বর, ওজন কমে যাওয়ার মতো ছোট-খাটো উপসর্গ দেখা দেয় যাকে এইডস-রিলেটেড কমপ্লেক্স বলা হয়। এদের মধ্যে অল্প সংখ্যক মানুষ পরবর্তীকালে এইডস-এর শিকার হন যখন তাঁদের শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবার ফলে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ক্যান্সার জাতীয় ভারী রোগ আক্রমণ করে। এবং শেষ দিকে এইডস আক্রমণ করে মস্তিষ্ককে, যার ফল হল স্মৃতি নষ্ট, চোখে না দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ যতো ভয়ঙ্কর রোগই হোক এইচ আই ভি+মানুষদের একাংশ বহুদিন পর্যন্ত সুস্থভাবেই বেঁচে থাকতে পারেন। এবং এটাও খুব পরিষ্কার যে এইডস রোগী এবং এইচ আই ভি+মানুষেরা একই শ্রেণীতে কখনোই পড়েন না। অথচ আশ্চর্য্যজনকভাবে, সরকারী মহলের উদ্যোগে সমস্ত এইচ আই ভি+মানুষদের গায়েই এইডস রোগীর ছাপ্পা মেরে দেওয়া হচ্ছে।

এইডস-এর সত্যি মিথ্যে ঃ

আমাদের দেশে একটা ধারণা চালু আছে যে এইডস একটা মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ যার জন্য এই রোগীদের কাছে থেকে সভয়ে একটা দুরত্ব রেখে চলা হয়। এমনকি, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক মহলেও এই ধারণা যে কতোটাই বদ্ধমূল সেটার সাক্ষী আছে বহু ঘটনাই যার কথা পরে বলছি। তার আগে, এই রোগ কি করে ছড়িয়ে পড়ে সে সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, রক্ত বা রক্তজাত কোনো পদার্থ মারফৎ এইচ আই ভি+ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির রক্তে এইচ আই ভি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এছাড়াও একজন এইচ আই ভি+ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনের ছুঁচ যদি জীবাণুমুক্ত না করেই অন্য কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তাহলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির দেহে এইচ আই ভি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এবং শুধুমাত্র এই কারণেই মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা এই রোগের সহজ শিকার।

দ্বিতীয়তঃ, যৌন-সংসর্গের সময়ে রক্ত, বীর্য বা জরায়ুক্ষরণ থেকেও এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে। যে কোনো শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (মিউকাস মেমব্রেন) ক্ষরণেই এইচ আই ভি থাকতে পারে তবে সম্ভবতঃ মুখনিঃসৃত লালায় এর উপস্থিতি নেই।

তৃতীয়তঃ, এইচ আই ভি+মায়েদের শিশুরা এইডস ভাইরাসের শিকার হয় গর্ভে থাকাকালীন অথবা সম্ভবতঃ প্রসবের সময়েই।

আরো জানা প্রয়োজন যে শরীরের বাইরে এইচ আই ভি আসলে এক দুর্বল জীবাণু (ভাইরাস)। তাপে, সাধারণ সাবান ও জলে, ক্লোরিনে, লাইজলে ইত্যাদি সাধারণভাবে জীবাণুমুক্ত করার যে কোনো পদ্ধতিতেই একে ধ্বংস করে ফেলা সম্ভব।

এইডস বিল ও 'বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠী'

'89 সালের 18ই আগস্ট, রাজ্যসভায় গৃহীত হল 'এইডস প্রিভেনসন বিল' যার মারফৎ অপরিসীম ক্ষমতা পেল সরকার, সাধারণ মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতায় ও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করার। এই বিলে এইডস প্রতিরোধ-সংক্রান্ত বা রোগের সুষ্ঠু চিকিৎসা-সংক্রান্ত কোনো যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে না গিয়ে এমনিতেই যারা সমাজের প্রান্তদেশে অবস্থান করে এরকম অবহেলিত এবং উপেক্ষিত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীকে এইডসের জন্য দায়ী করা হল। এঁদের বলা হল 'বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠী' (হাই রিস্ক গ্রুপ)। দেহ-শ্রমিক নারীরা, পেশাদার রক্তদাতারা, মাদকাসক্ত মানুষেরা এবং সমকামীরা এই তালিকার আওতায় পড়লেন। অথচ এইচ আই ভি কী করে ছড়ায় তা লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাবো যে এই বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠী-র তকমাটা কতোটাই ঠুনকো। ব্যক্তি বিশেষ কী ধরণের জীবন-যাপন করেন তার উপরেই শুধু এই সংক্রমণ নির্ভর করে না—ব্লাড ব্যাঙ্ক, রক্তজাত পদার্থ প্রস্তুতকারক সংস্থা আর হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা কী করছেন তার উপরেই প্রধানত সংক্রমণ নির্ভর করছে। আর তাই, শুধু বিশেষ কোন গোষ্ঠী নয়—বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি আমরা তথাকথিত সভ্য, ভদ্র নাগরিকরাও।

আই সি এম আর-এর দেওয়া হিসেব অনুসারেই, '85 সালের অক্টোবর থেকে '90 সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মোট 4,61,118টি রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয় তথাকথিত বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন মানুষের। এর মধ্যে এইচ আই ভি পাওয়া যায় 2,167টি নমুনায় এবং এদের মধ্যে এইডস রোগী মাত্র 44 জন।

এইডস বিলটির চার নং পরিচ্ছেদে চিকিৎসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় এইচ আই ভি+বা এইডস আক্রান্তদের অথবা মাদকাসক্তদের খবর যেন তাঁরা অতি অবশ্যই স্বাস্থ্যমন্ত্রককে জানান।

পরিচ্ছেদ পাঁচ-এ স্বাস্থ্যমন্ত্রককে অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কোনও সন্দেহজনক মানুষকে জোর করে জেরা করা, রক্ত পরীক্ষা করা ও এইচ আই ভি+মানুষদের আলাদা আটক রাখার এমনকি, সংক্রমণ রোখার প্রয়াসে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় এই সমস্ত মানুষদের ছবি শুদ্ধ পরিচয়

ছাপানোর অধিকারও) আরো আছে। এইচ আই ভি+মানুষকে কর্মস্থল থেকে ছাঁটাইয়ের অধিকার আছে কর্তৃপক্ষের; বিবাহিত দম্পতির ক্ষেত্রে ডিভোর্সের অধিকারও। এ'সব ক্ষেত্রে সত্যি-সত্যিই অভিযুক্ত ব্যক্তি এইচ আই ভি+কিনা সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবারও প্রয়োজন নেই—কোনো ডাক্তারের সার্টিফিকেট বা কারুর নিছক সন্দেহই যথেষ্ট। আর আক্রান্তদের তো আইনের দ্বারস্থ হবার অধিকার দেওয়াই যায় না!

হাসপাতাল, ব্লাড ব্যাঙ্কে একই সিরিঞ্জ বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার ফলে অথবা রক্তজাত পদার্থ তৈরীর উৎপাদকেরা ব্যবহৃত রক্তের এইচ আই ভি পরীক্ষা না করার ফলে এইডস সংক্রমণ যে কতো গুণ বেড়ে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষ (সরকারী দৃষ্টিতে 'নির্দোষ') এই রোগের শিকার হচ্ছে—এদের জন্যে কিন্তু কোনোরকম আইনানুগ ব্যবস্থা নেবার উল্লেখ মাত্র নেই এইডস বিলে।

সরকারী আইনের 'যথোপযুক্ত' প্রয়োগ ঃ

1990 সালের 26শে মে পূর্ব বোম্বাই-এর এক নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে 824জন তামিল মহিলাকে 'উদ্ধার' করা হল মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু পুলিসের সহায়তায়। এই অভিযানের সক্রিয় উদ্যোক্তা ছিল 'সাবধান' নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। জানা গেছে প্রত্যেককে চাকরী দেবার ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তামিলনাড়ু সরকার এক বিশেষ ট্রেনে করে (নাম, মুক্তি এক্সপ্রেস !) বোম্বাই থেকে এই মহিলাদের ও প্রায় 80টি শিশুকে মাদ্রাজ নিয়ে আসে।—এই পর্যন্ত ছিল সরকারী চমক! আদতে এদের জন্যে সরকারী তরফে পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। মাদ্রাজ স্টেশনে এক মন্ত্রী এঁদের স্বাগত জানাতে হাজির ছিলেন ঠিকই কিন্তু অতঃপর এঁদের নিয়ে কী করা হবে সেই চিন্তা করার ফুরসৎ আগে মেলেনি। এতোক্ষণে সরকারের হুঁশ হয় এতোজন মানুষের খাবার বা থাকার ব্যবস্থা কোথায় করা যায়? প্রাথমিকভাবে ঠিক হয় শহরের উপকণ্ঠে 'পুঝল' (Puzhal)-এ নির্মীয়মান উন্মুক্ত কারাগারে পাঠানো হবে—যেখানে খাওয়া-দাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত তখনো পর্য্যন্ত হয়ে ওঠেনি! আবার কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কাছেও সাহায্যের অনুরোধ করা হয়। সরকারী মহলে এইসব জল্পনা-কল্পনা যখন চলছিল—দেখা গেল স্টেশনে অপেক্ষারত প্রায় 24 ঘণ্টা অভুক্ত রাখা মহিলারা ও শিশুরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। এঁদের ক্রোধের শিকার হলেন 30জন সরকারী কর্মী যাঁরা মূলতঃ এঁদের দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন। অবশেষে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে গেলে পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চালাতে শুরু করে মহিলাদের উপর। শেষমেশ সমস্ত মহিলা ও শিশুদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় এক উদ্ধার-আশ্রমে। এর পরের খবর, এই মহিলাদের সকলের রক্তের এলিজা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং দেখা গেছে এঁদের বেশীর ভাগই নাকি এইডস-আক্রান্ত! কারুর ক্ষেত্রেই নিশ্চিত হবার জন্য এই পরীক্ষা দ্বিতীয়বার করা হয়নি—ওয়েস্টার্ণ ব্লট পদ্ধতির তো প্রশ্নই ওঠে না!

অন্যদিকে, সরকারী তরফে চলছে এঁদের আটকে রাখাকে কীভাবে আইনসিদ্ধ করা যায় তারই নানান প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেছে যে এঁদের মধ্যে একজন মহিলা (এইডস-রোগী বলে প্রচারিত) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন, আরেকজন হাসপাতালে মারা গেছেন (কারণ জানা যায়নি) এবং আরো দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাকীরা সবাই ধীরেসুস্থে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছেন।

রোগ ছড়াচ্ছে কারা—পেশাদার রক্তদাতারা ঃ

পেশাদার রক্তদাতারা আর এক 'ঘৃণ্য শ্রেণী' সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীতে। কারণ এঁরাই নাকি এইডস ছড়াচ্ছেন সুস্থ মানুষের দেহে। যদিও সে অসুখটা এঁরা হয়তো শরীরে গ্রহণ করেছেন কোনো সরকারী হাসপাতালের বদান্যতায় যারা জীবাণুমুক্ত না-করা সিরিঞ্জ ব্যবহার করে—তার থেকেই! যেমনটা অনেক স্বেচ্ছা-রক্তদাতাদেরও হয়ে থাকে। আর এসবের চেয়েও বড়ো কথা—আমাদের দেশে স্বেচ্ছা রক্তদাতার সংখ্যা এতোই নগণ্য যে দুঃসময়ে এই পেশাদার রক্তদাতাদের কাঁধে চেপেই আমাদের প্রয়োজনের বৈতরণী পেরোতে হয়। দিল্লীতে এক সমীক্ষা অনুযায়ী সফদরজঙ্ হাসপাতালের বাৎসরিক রক্তের চাহিদা 17,800 ইউনিট, যেখানে পরিবর্ত দাতাদের থেকে পাওয়া যায় 4,250 ইউনিট, রেড-ক্রশ সোসাইটি যোগায় 2,250 ইউনিট এবং বাকী 11,300 ইউনিট আসে ভাড়াটে বেসরকারী ব্লাড-ব্যাঙ্কগুলো থেকে যার উৎস পেশাদার দাতারাই। কাজেই পেশাদারদের অবজ্ঞা করার সময়ে এই ভয়ানক সত্যটাও মনে রাখা উচিত। হাস্যকর সরকারী প্রস্তাব এটাই যে যেহেতু ব্লাড-ব্যাঙ্ক বা হাসপাতালে এইডস পরীক্ষা করা হয় না সংগৃহীত রক্তের, তাই রক্তদাতারই মহান দায়িত্ব থেকে যায় প্রতিবার দান করার সময়ে রক্তের এইচ আই ভি পরীক্ষাটা করিয়ে নেবার!

বেসরকারী উদ্যোগে সরকারী 'ছাড়' ঃ

1989 সালের জানুয়ারী/ফেব্রুয়ারী নাগাদ ভারতীয় ড্রাগ কনট্রোলার দেশের সমস্ত রাজ্যে জরুরী তারবার্তায় জানালেন যে এক বেসরকারী রক্তজাত পদার্থ প্রস্তুতকারক সংস্থার উৎপন্ন দ্রব্যে এইচ আই ভি পাওয়া গেছে। কাজেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। কেউ কেউ এ'খবরে সাড়া দিল, কেউ বা দিল না। ইতিমধ্যেই ঐ সংস্থার ঐ ব্যাচের উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়ে গেছে। কারণ উৎপন্ন দ্রব্যটির নির্মাণকাল ছিল 1988!—জানা গেছে, আমাদের দেশে আরো আটটি এই রকম বেসরকারী সংস্থা আছে যারা বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করে থাকে রক্ত থেকে। এবং এইসব রক্ত সংগ্রহ করা হয় মূলতঃ পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকেই। এই রক্তের এইচ আই ভি পরীক্ষা তো হয়ই না এমনকি যে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করলে এইচ আই ভি+রক্ত থেকেও ভাইরাসমুক্ত উপাদান প্রস্তুত করা সম্ভব (আমেরিকাতে যা হয়ে থাকে)

—সে' সব প্রক্রিয়াও অনুসরণ করা হয় না। অথচ এইসব বেসরকারী উদ্যোক্তারা পুরোদস্তর ছাড় পেয়ে যায় এইডস বিল-এর প্রকোপ থেকে, সরকারী অন্যান্য কানুন থেকেও!

চিকিৎসক-মহলে এইডস ভূতের তাণ্ডব ঃ

ভয়ানক অসুস্থ এক আফ্রিকান কূটনীতিক দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ভর্ত্তি হলেন 12রা জানুয়ারী '90-তে যাঁর এক জীবনরক্ষাকারী অপারেশন প্রয়োজন ছিল এবং সেইমতো 15ই জানুযারী অপারেশনের দিন ধার্য্য করা হয়েছিল। রক্ত পরীক্ষা করার সময়ে হঠাৎই দেখা গেল তাঁর রক্তে এইচ আই ভি আছে। অতএব হাসপাতালের চিকিৎসক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন 20শে জানুয়ারী। এই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্র মহল যখন তুমুল আলোড়ন তুলল, দেখা গেল যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে প্রকৃত তথ্যের আকাশ পাতাল ফারাক। যেমন—(1) হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, এইমস-এর চিকিৎসক এবং কর্মীরা এইডস রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কে একেবারেই ওয়াকিফহাল নন—তাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি ঐ কূটনীতিকের কোনও চিকিৎসা করার। (2) কোনো এইডস রোগীর জন্য এণ্ডোস্কোপ (যার প্রয়োজন ছিল এ'ক্ষেত্রে) ব্যবহার করলে নাকি সেটা পুরোপুরি অব্যবহার্য হয়ে যায়। ফলে দু'লাখ টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই এণ্ডোস্কোপি করাটা অসম্ভব ছিল। (3) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর নাকি কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেই এইডস রোগীর মৃতদেহ নিয়ে কি করা হবে সেই বিষয়ে। আর থাকলেও তা' এতোই পুরনো নিয়মকানুন, যা আজকে অচল।

এবার এর পাশাপাশি সত্যটা কী দেখা যাক। (1) বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও একজন নার্স-কে হু-এর অধীনে ছ' সপ্তাহের এক বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল এইচ আই ভি আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য। (2) কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা দপ্তর (Central Bureau of Health Education)-এর সর্বশেষ প্রচারিত খবরে জানা গেছে যে এইচ আই ভি+মানুষের ব্যবহার করা এণ্ডোস্কোপ আবার অন্য রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করায় কোনই বাধা নেই কারণ একে সাধারণভাবে জলে ফুটিয়ে, বা ইথানল, ফরম্যালডিহাইড জাতীয় আরো বহু রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে (যেগুলো সব হাসপাতালেই পাওয়া যায়) সহজেই জীবাণুমুক্ত করা যায়। (3) হু-এর বিভিন্ন পুস্তিকায় খুব পরিষ্কার ভাবেই এইডস রোগীর দেহ নিয়ে কি করতে হবে তা বলা আছে।

আফ্রিকান কূটনীতিকের এই ঘটনায় সবচেয়ে আপত্তিজনক জায়গা ছিল রোগীর নাম, পরিচয়, ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করায়, অন্যান্য দেশে যে ব্যাপারে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। অনেক শোরগোলের পর এ' ব্যাপারে লোকদেখানো এক এনকোয়ারি কমিটি তৈরী করা হলেও কমিটি মূল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গেছে অথচ কেন এই রোগীর জীবনরক্ষাকারী অপারেশন হল না, বা যারা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হল না—সে' প্রশ্ন আজও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

চিকিৎসা-মহলে এইডস-ভীতি এতোটাই প্রবল যে প্রশ্ন জাগে, আমাদের দেশের চিকিৎসকরা কি আদৌ কিয়ৎ পরিমাণেও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী না কি তাঁরাও আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতোই সরকারী ভ্রান্ত প্রচারে প্রভাবান্বিত? চিকিৎসকরা যে আতঙ্কের দরুণ এইডস রোগীদের চিকিৎসা করতে চাইছেন না সে ব্যাপারে বলা যায় যে চিকিৎসা করতে গিয়ে এইড্‌সের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা হেপাটাইটিস বি-এর তুলনায় 100 ভাগ কম। তাই হেপাটাইটিস বি-এর রোগী পরীক্ষা করার সময়ে বা চিকিৎসা করার সময়ে যে-যে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, এইডস রোগীর ক্ষেত্রে সেই সাবধানতাই যথেষ্ট! নিউ-ইয়র্ক শহরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এইডস-এর জন্য নতুন-নতুন সাবধানতা নেবার পাশাপাশি এইডস-রোগীর চিকিৎসায় অস্বীকার করলে চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার আইন আছে। অ্যামেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, ব্রিটিশ রয়্যাল কলেজ অফ নার্সিং এবং দি ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নীতিগত ঘোষণা করেছে যে এইচ আই ভি+ এবং এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দেবার কোনও যৌক্তিকতাই নেই।

এবার এসবের পাশাপাশি আমাদের দেশের চিকিৎসা-মহলের কয়েকটা ছবি দেখা যেতে পারে।

(1) দিল্লীর দুই ভাই রোহিত আর বিনীতের শরীরে জন্মের কিছুকাল পর থেকেই হিমোফিলিয়ার (রক্তের জমাট বাঁধার উপাদানের অভাব-জনিত রোগ) লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। স্বভাবতঃই কিছুদিন অন্তর এদের রক্ত বা তার বিশেষ উপাদান নিয়মিতভাবে নেবার প্রয়োজন হয়। হঠাৎই দেখা যায় এরা এইচ আই ভি বহন করছে এদের রক্তে—যেটা খুব নিশ্চিতভাবেই রক্ত নেবার সময়ে এসেছে। অতএব এদের একজনকে আমি বেস হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে বলা হল যেখানে সে চিকিৎসার প্রয়োজনে ভর্তি ছিল। এইমস ও যথারীতি তাকে ভর্তি করতে অস্বীকার করল। এখন তারা কোনও চিকিৎসকের সাহায্যই পাচ্ছে না এমনকি এদের নিয়মিতভাবে রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন থাকলেও ল্যাবরেটরী থেকে এদের রক্ত অপরীক্ষিত অবস্থাতেই ফেরৎ আসছে।

2) বোম্বাই শহরে এমন তিরিশজন কিডনির রোগী আছেন যাঁদের নিয়মিত ভাবে হিমোডায়ালিসিস প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এঁরা সকলেই এইচ আই ভি আক্রান্ত হয়েছেন কোনো না কোনো ডায়ালিসিস-এর সময়ে যখন তাঁদের বাইরে থেকে রক্ত দেওয়া হয়। অতএব সরকারী বেসরকারী কোনো হাসপাতালই আর এঁদের চিকিৎসায় সম্মত নয়।

3) মাদ্রাজের 824 জন মহিলাকে বোম্বাই-এর নিষিদ্ধ অঞ্চল থেকে

'উদ্ধার' করে নিয়ে যাবার পর তাদের সবাই-ই এইচ আই ভি+এই সন্দেহে স্থানীয় হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের স্পর্শ এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই মহিলাদের হাত থেকে সরাসরি হাসপাতালের টিকিট নিতে অস্বীকার করে বলা হয় সেগুলো নিজেরাই যেন টেবিলে এসে রেখে যান।

4) এইচ আই ভি+তিন মাসের এক শিশু দক্ষিণ বোম্বাই-এর জে জে হাসপাতালে সম্পূর্ণ অচিকিৎসিত অবস্থায় মারা যায়। প্রাথমিক ভাবে, তাকে ভর্তি নিতেই অস্বীকার করা হয়েছিল কিন্তু ইণ্ডিয়ান হেলথ অর্গানাইজেশনের এক ডাক্তারের প্রচেষ্টায় ভর্তি করা সম্ভব হলেও কোনো চিকিৎসকই এই শিশুর ধারেকাছে ঘেঁসেননি, চিকিৎসা তো দূর অস্ত্!

5) কলকাতার চিকিৎসককুলের আপত্তি থাকায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এইডস চিকিৎসার আলাদা ইউনিট খোলার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

অবশ্য খোদ এইমস-এ আফ্রিকান কুটনীতিকের ঘটনা নিয়ে আলোড়ন হবার পর সরকার 20 লাখ টাকা মঞ্জুর করেছিল এইডস রোগীদের চিকিৎসায় আলাদা ইউনিট খোলার জন্য। সেই ইউনিটের কী হলো—এ প্রশ্ন না তোলাটাই বোধহয় শিষ্ট ও সুবোধ নাগরিকের পরিচয়!

বিজ্ঞানীদের চোখে এইডস ঃ

উচ্চ পর্যায়ের সরকারী প্রতিষ্ঠান আই সি এম আর সর্বপ্রথম এ'দেশে এইডস নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা সমীক্ষার এবং সাধারণ মানুষকে সঠিক তথ্য দেবার বদলে ভ্রান্ত প্রচার ও ভীতি-উদ্রেকের মহৎ উদ্যোগ হাতে নেয়। আই সি এম আর-এর ডিরেক্টর জেনারেল এ এস পেণ্টালের মতে—মহিলারাই হলো এক খারাপ গোষ্ঠী যারা শরীরে এইডস ভাইরাস গ্রহণ করছে বিদেশী বা অনাবাসী ভারতীয়দের সাথে শুয়ে। এই কল্পনায় নারী দেহ-শ্রমিকদের ছোঁয়াচের বাস্তব প্রতিমূর্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হচ্ছে। 'বেশ্যা' কথাটা আমাদের চিকিৎসা জগতের কর্তাব্যক্তিদের কাছে এক অন্ধকার বিপদ, যার মধ্যে দিয়ে নাকি ছড়িয়ে পড়বে এইডস।

এক্ষেত্রে রোগটাকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে মহিলাদের নীচ ও নোংরা করে দেখানোর মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার করার চেষ্টা চলছে। বাস্তব সমীক্ষা ও তথ্যের বদলে গোঁড়ামি-ভিত্তিক নৈতিকতা আমাদের দেশে যৌনতার প্রশ্নটিকে উজ্জ্বল ভাবে, স্পষ্ট ভাবে সামনে আসতে দেয় না। এক্ষেত্রে সেই রক্ষণশীল পুরুষ কর্তৃত্ববাদি মনোভাবই এইডসকে ঘিরে বিকৃত প্রচারের জন্ম দিচ্ছে। অথচ শারীরবিজ্ঞানের দিক থেকে দেখতে গেলে, রোগ ছড়াবার বাহকের চেয়ে মহিলারাই এই রোগের শিকার হবার সম্ভাবনা বেশী। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির এক সমীক্ষায় দেখা গেছে একজন এইচ আই ভি+মহিলার থেকে পুরুষদের রোগগ্রস্থ হবার সম্ভাবনা যদি 2% হয়, তবে উল্টোদিকে একজন এইচ আই ভি+পুরুষের থেকে মহিলাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় 20%! আই সি এম আর-এর ভিত্তিহীন বিভ্রান্তি ছড়াবার প্রচেষ্টার আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। 1990 এর জুলাইতে প্রচারিত এক রিপোর্টে আই সি এম আর দাবী করে যে '95 সাল নাগাদ বোম্বাইতে প্রতি তিনজন গৃহবধূর মধ্যে একজন এইডস আক্রান্ত হবে। এই প্রচারে সচেতন জনসমাজে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হয়। অনেকে পেণ্টাল-এর পদত্যাগ দাবী করেন এইরকম মনগড়া ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের জন্য। অবশেষে প্রচুর সমালোচনার চাপে পড়ে আই সি এম আর তাদের পরিসংখ্যান পাল্টে জানায়, প্রতি তিনজন গর্ভবতী মহিলার একজন। অর্থাৎ, এই রিপোর্টের ভিত্তি কতোটা বৈজ্ঞানিক এবং কাল্পনিক কতোটা—এটা খুব সহজেই অনুমেয়।

বোম্বাই-এর সাংবাদিক মহলের তৎপরতায় পাওয়া গেছে আরো এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। আই সি এম আর-এর প্রচার অনুযায়ী বোম্বাই-এর নারী দেহ-শ্রমিকদের মধ্যে এইচ আই ভি+আছেন 20%। সাংবাদিকদের তথ্য অনুযায়ী, আই সি এম আর-এর সমীক্ষক দল একজন মহিলাকেই তিনমাসে তিনবার করে পরীক্ষা করেছে—সংখ্যাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং তৎসূত্রে সরকারী দাক্ষিণ্যলাভের আশায়। ডাঃ মানিয়ার (Dr. Maniar) যিনি একটি যৌনরোগের ক্লিনিক চালান বোম্বাই-তে, জানিয়েছেন, তাঁর হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা কখনোই 7%-এর বেশী নয়।

সদিচ্ছায় কী না-হয়?

সরকারী তরফে সত্যিই যদি কোনো সদুদ্দেশ্য থাকে এইডস প্রতিরোধ করার তাহলে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নেওয়াটা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। আলাদা করে প্রতিটি মানুষের কাজকর্ম, পেশা, ব্যক্তিগত জীবন, নেশা ইত্যাদি সমস্ত জায়গাগুলোর যে বিশাল ব্যাপ্তি—তার তদারকি করা বা আইন করে নিজের পছন্দমতো চালানো নিতান্তই অসাধ্য এক প্রক্রিয়া, নীতি-অনীতির কথা বাদ দিলেও। অথচ খুব সহজেই এবং কার্যকরীভাবে এইডস সংক্রমণ বন্ধ করা সম্ভব হতে পারে সমস্ত হাসপাতাল ও ব্লাড-ব্যাঙ্কে প্রতিটি রক্তের নমুনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করে এবং সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা করে। আরো উচিত, রক্তজাত পদার্থ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলোকে উৎপন্ন দ্রব্যের এইচ আই ভি পরীক্ষায় বাধ্য করা এবং অন্যথায় আইনানুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা-গ্রহণের বন্দোবস্ত করা।

আর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, এইচ আই ভি+ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় গোপন রাখার। রোগীদের নাম-পরিচয়-ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করা নেহাৎই এক বোকামী। কারণ, খুব স্বাভাবিকভাবেই, যারা এই প্রচারের সম্মুখীন হয়েছে তারা (যদি না ইতিমধ্যেই বন্দী হয়ে থাকে) তো বটেই—যারা সম্ভাব্য রোগাক্রান্ত, তারাও সবাই নাম-পরিচয় গোপন করে গোপন জীবনযাপনের পথে পা বাড়াবে। কলকাতার খিদিরপুরের নারী

দেহ-শ্রমিক টিকলিবাঈ-এর ক্ষেত্রে যেমনটা ঘটেছে। অর্থাৎ, এইডস রোগের সংক্রমণ এর ফলে বন্ধ তো হবেই না—ভেতরে ভেতরে ছড়াতে থাকবে। পরিচয় গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি পেলে তবেই কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এইচ আই ভি পরীক্ষা করাতে আসতে পারে।

মাদকাসক্তদের ক্ষেত্রেও যদি কোনো ওষুধের দোকান বা এই ধরণের কোনো জায়গা থেকে বিনা পয়সায় সিরিঞ্জ বিলির বন্দোবস্ত থাকে (সেখানে কেউ গেলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এই ব্যবস্থা না করে) তাহলে মাদকাসক্তদের সংখ্যা কমানো না গেলেও এইডস রোগীর সংখ্যা তো কমবে!

নারী দেহ-শ্রমিকদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমানো যেতে পারে যদি তাদের জন্যে বিনা পয়সায় কনডোম বিলির ব্যবস্থা থাকে। আর এ চিন্তাটাও খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়—দিল্লীর জি বি রোডের স্বেচ্ছাকর্মীরা কিন্তু এ' প্রক্রিয়ায় খুব ভালো ফলই পেয়েছেন।

সমকামীদের মধ্যেও নিরাপদ যৌন-সংসর্গ সম্বন্ধে শিক্ষামূলক প্রচার এই গোষ্ঠীর মধ্যে এইডস সংক্রমণ কমাবার এক প্রচেষ্টা হতে পারে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষ এবং সরকারী ভাষায় 'বেশী ঝুঁকি সম্পন্ন মানুষ'—সবার ক্ষেত্রেই সরকারের ভীতি-উৎপাদক ভ্রান্ত প্রচারের চেয়ে শিক্ষামূলক প্রচারটাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

অর্থাৎ, আমরা বলতেই পারি যে ক্ষমতা, আইন বা বাহুবল কোনোটাই নয়—এই মারণ-অসুখের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন শুধু বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানুষের প্রতি সহমর্মিতা, সদিচ্ছা এবং সহজ, সরল কিছু সাবধানতার ধারণা। প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাবে এতেই।

[মূল পুস্তিকা : উইমেন অ্যাণ্ড এইডস—ডিনায়েল এ্যাণ্ড ব্লেম : আ সিটিজেনস্ রিপোর্ট। নভে.-ডিসে. '90, নিউ দিল্লী। যোগাযোগ, ডঃ জে পি জৈন, এ-78/1, নন্দ রাম পার্ক, উত্তম নগর, নিউ দিল্লী-110059]

—স্বাতী

M/s Daga Engineering & Mining Industries

18, NETAJI SUBHAS ROAD
CALCUTTA-700001

এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন—রিপোর্ট

18ই মার্চ দুপুরে দিল্লীর 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' নিউ দিল্লী মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের (এন ডি এম সি) সদর দপ্তরের বাইরে একটা প্রতিবাদ অবস্থান করে। এন ডি এম সি-র অতি আধুনিক আকাশ-ছোঁয়া অফিসের সামনে এই ছোট্ট 20-25 জনের প্রতিবাদ খুব প্রতীকি দেখতে লাগছিল, বিষয়টা এত নতুন—কেউ বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি এবং তাই বহুবার ঘুরে ঘুরে একই কথা বুঝিয়ে বলতে হচ্ছিল। ঘটনা হল, মোতিবাগ অঞ্চলের এন ডি এম সি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া রোগের (জন্ম থেকে পাওয়া এক ধরণের তীব্র রক্তাল্পতা) একটি ওয়ার্ড আছে। সেখানে এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদের রক্ত দেওয়া হয়। এখানকার নার্স ও টেকনিসিয়ানরা হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দেন। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে বিক্ষোভ জানাচ্ছিলেন যে বাচ্চাদের জন্য রেডক্রস থেকে পাঠানো রক্তে এইচ আই ভি আছে কি না তা পরীক্ষা করা হচ্ছে না, ফলে অনেক বাচ্চাকে রক্ত দেওয়ার সময়ে হয়ত এইডসের শিকার বানানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে এইডস যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা—যেমন দস্তানা, ফেলে দেওয়া যায় এমন সিরিঞ্জ, মুখ দিয়ে রক্ত টানার বিকল্প যন্ত্র—করা হচ্ছে না। এমন কি আসল পরিস্থিতি কি তাও গোপন করা হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী এন ডি এম সি-র এই হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে এইচ আই ভি ছড়িয়ে পড়েছে 30·3% হারে। নিশ্চিতভাবেই এর জন্য দায়ী রক্ত সরবরাহকারী সংস্থাগুলি—এক্ষেত্রে যার সিংহভাগ দেয় রেডক্রস। এই অবস্থায় যখন স্বাস্থ্য কর্মীরা দেখেন কেউ তাঁদের কথা শুনছে না তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। তবুও স্বাস্থ্যকর্তারা চুপ। এই মর্মান্তিক খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গে দু'দিনের চেষ্টাতে 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' এক প্রতিবাদ অবস্থানের আয়োজন করে।

প্রতিবাদ চলাকালীন উত্তেজিত ভাবে কর্মীরা সাংবাদিকদের বোঝাচ্ছিলেন—ভারত তথা দিল্লীর স্বাস্থ্যকর্তারা এইডস সম্বন্ধে শিক্ষার নামে 30 কোটি টাকা খরচ করেছে পাঁচতারা মার্কা ওয়ার্কশপ ও বিদেশে দৌড়োদৌড়ির মাধ্যমে। পাশাপাশি তারা ইঙ্গিত করছে বিভিন্ন গণ-মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে এইডসের জন্য দায়ী তথাকথিত 'বেশী ঝুঁকি-সম্পন্ন গোষ্ঠী'গুলি। অথচ তাদের চোখের সামনে এইডস ছড়াচ্ছে রেডক্রস, এন ডি এম সি, স্বাস্থ্য বিভাগের অপদার্থতা।

একদিকে সরকার এইডস রোখার নামে হামলা চালাচ্ছে নারী দেহ-শ্রমিকদের উপর; এইচ আই ভি+লোকেদের সাথে মধ্যযুগের ডাইনী পুড়িয়ে মারার মত আচরণ করছে—অন্যদিকে হাসপাতাল কর্মীদের এইডস থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট সস্তা সুরক্ষা (যেমন ফেলে দেওয়া যায় এরকম সিরিঞ্জ) ও দিচ্ছে না বা রেডক্রসের দেওয়া রক্তের এইচ আই ভি নির্ণায়ক পরীক্ষা করাচ্ছে না।

আই সি এম আর, রেড ক্রস, এন ডি এম সি—এই সব বড় বড় সরকারি জমিদারীর এ ব্যাপারে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, ও প্রায়-অপরাধী আচরণ সম্পর্কে চার ঘণ্টা ধরে প্রচুর কথা বললেন বিক্ষোভরত অল্প কয়েকজন মানুষ।

মজার ব্যাপার হল, ওই একই দিনে এন ভি এম সি-র সামনে তাঁদের উপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে জড়ো হয়েছিলেন একশ'রও বেশী দিল্লীর বিকলাঙ্গ মানুষ। তাঁরা অনেকেই এসেছিলেন তাঁদের হাতচালিত যানে করে। তাঁরাও এইডস এর ব্যাপারটা মন দিয়ে শোনেন। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সহযোগিতার ফলে একে অন্যের মাইক্রোফোন ব্যবহার করেন। শ্লোগানে গলা মেলান দু পক্ষই। একটু দূরে এন ডি এম সি-র চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও সোচ্চার হয়েছিলেন তাঁদের দাবী দাওয়া নিয়ে। সব মিলিয়ে এন ডি এম সি প্রাসাদের সিংহদরজা হয়ে উঠেছিল মুখর।

আন্দোলনের দাবী: যদি থ্যালাসেমিয়া ওয়ার্ড, যা সাধারণ মানুষের পয়সায় চলে, একদিনের জন্যেও খালি থাকে তবে মেডিকেল সুপারিনটেনডেণ্টকে সাময়িক বরখাস্ত করতে হবে। রেডক্রস সোসাইটির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। রক্ত এবং রক্তজাত পদার্থের পরীক্ষা পদ্ধতিকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কর্মচারীদের এইচ আই ভি এবং এইডসের ওপর প্রশিক্ষণ দিতে হবে, ব্যবস্থা করতে হবে তাদের যথাযথ সুরক্ষার। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে, যার রিপোর্ট জানাতে হবে সাধারণ মানুষকে। এর ফলে এই কুকাজের দায়িত্ব কার সেটা খুঁজে বার করা সম্ভব হবে। এটাই আজকের দাবী।

প্রসঙ্গ ঃ নর্মদা

● গুজরাট থেকে প্রকাশিত 'অনুমুক্তি' পত্রিকার সম্প্রতি প্রকাশিত সংখ্যায় সম্পাদকীয়টি শুরু হয়েছে কুরুক্ষেত্রের সেই বর্ণনা দিয়ে, যেখানে দু পক্ষে জড়ো হয়েছেন এমন সব মানুষ যাঁরা একে অন্যের বন্ধু বা আত্মীয়। নর্মদা প্রকল্পকে ঘিরে গুজরাট-মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে যখন একদিকে নর্মদা উপত্যকার আক্রান্ত মানুষেরা এবং অন্যদিকে নর্মদার শক্তিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের গুজরাটের পক্ষে আন্দোলনকারীরা দাঁড়ালেন, তখন অনুমুক্তি'র সম্পাদকীয়তে এই উপমা আসতেই পারে।

কিন্তু এর পরে বোধহয় 'ধর্ম' কোন পক্ষে সে আলোচনা এসেই পড়ে! বিশেষতঃ যখন নর্মদা উপত্যকার বিপন্ন আদিবাসীদের সামনা সামনি এসে দাঁড়ায় গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স-এর ক্ষমতা বা লাক্সারি বাসে করে আনা সরকারী কর্মচারিদের রণং দেহি মূর্তি।

এ প্রসঙ্গে আমরা পরপর দুটি লেখা রাখছি। —সঃ মঃ ●

'সংঘর্ষ যাত্রা'—একটি প্রতিবেদন

বিনাশকারী সরদার সরোবরের বিরুদ্ধে নর্মদাঘাটীর হাজার হাজার আদিবাসী, কৃষক, মজদুর, মহিলা ও পুরুষ প্রায় 36 দিন 'সংঘর্ষ যাত্রা' করেন। এই সময়ে আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর সহ ঘাটীর অন্য প্রতিনিধিরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনও করেন। 22 দিন অনশন চলার পর নর্মদাঘাটীর গ্রামবাসীরা সরদার সরোবরের বিরোধে আরো সশক্ত ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার সংকল্প নেন ও অনশনরত সাথীদের অনশন ভঙ্গ করার জন্য আহ্বান জানান। সারা দেশের বিভিন্ন লোক সংগঠন 'নর্মদা সংঘর্ষকে' সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়।

30শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতিথিতে গুজরাতে গান্ধীবাদী সিদ্ধান্ত ও মূল্যের মৃত্যু হয়েছে! আদিবাসী ও কৃষক প্রতিনিধিরা জোর গলায় বলেন—এই মানববিরোধী ও অসংবেদনশীল সরকারের কাছে তারা কোন রকম দাবী করবেন না। এমনকি সরদার সরোবর-এর পুনর্বিচারের দাবীও করবেন না। তাঁরা ভারতীয় সংবিধানে ভারতবাসীর জন্য যে অধিকার রয়েছে তাকে রক্ষা করবেন। এই অবসরে গ্রামে বানানো 'সংকল্প স্তম্ভ'-র নিকট সবাই শপথ নেন। আজ থেকে সবাই নিজের গ্রামে জনতারাজ চালু করবে ও সরদার সরোবর পরিযোজনার কোন অধিকারী, ব্যক্তি বা সংস্থাকে গ্রামে ঢুকতে দেবে না। আদিবাসী গ্রামগুলোতে ডাক্তার ও শিক্ষক ছাড়া কোন সরকারী কর্মীকে ঢুকতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'হমারা গাঁও মে, হমারা রাজ—শাসন-ওয়ালে সুনলো আজ' ঘোষণা করে 'সংঘর্ষ যাত্রা' গ্রামে ফিরে আসে।

সরকারের আসলরূপ এই 'সংঘর্ষ যাত্রা'য় লোকের সামনে খুলে যায়। এক দিকে জনবিরোধী ও গরীববিরোধী সরকারকে সাহায্য করার জন্য গুজরাতী সংবাদপত্র সমূহ ও কিছু সংগঠন ও অন্যদিকে নতুন সত্যিকারের বিকাশের জন্য আন্দোলনরত কৃষক ও আদিবাসী। একটা বুনিয়াদী জিজ্ঞাসা—এই দেশে সামাজিক আন্দোলন, বিশেষভাবে দলিত ও পীড়িত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া লোকেদের আন্দোলন করার অধিকার আছে কি নেই?

ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, ঠিকাদার ও রাজনীতি নিয়ে খেলা যারা করে, তারা কতদিন জন জাগরণকে আটকে রাখবে। নর্মদা আন্দোলন এই জোটকে বারবার আঘাত করেছে। 'সংঘর্ষ যাত্রা'য় সমস্ত আদিবাসী ও কৃষকরা বারবার বলতে থাকে, "আমরা দেখে নেব, বাঁধ কি ভাবে তৈরী হয়। এই লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই। দেশকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই। আমরা এই স্বার্থান্বেষী লোকেদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করব।"

সংঘর্ষ যাত্রার কিছু ঘটনা বিবরণী

'লে মশালে চল পড়ে হ্যায়…'

25শে ডিসেম্বর রাজঘাট (বড়আনী) থেকে নর্মদার জল হাতে নিয়ে আমৃত্যু লড়াই করবার সংকল্প নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। বাবা আমতে, মেধা-পাটকর সহ নর্মদাঘাটীর লোকেদের নিয়ে সমর্পিত দল তৈরী হয়। প্রায় দু'হাজার নারী পুরুষ যেখানে বাঁধ তৈরী হচ্ছে তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। নিসরপুর, সিরকুঁআ, ফাটা, লচ্ছনী, আলিরাজপুর, চাঁদপুরে রাতে বিশ্রাম নিয়ে 'যাত্রা' চলতে থাকে। সারা রাত খোলা আকাশের নীচে প্রচণ্ড শীতে ডাল ও রুটি খেয়ে নর্মদাঘাটীর লোকেরা এগোতে থাকে। সাতপুরা ও বিন্ধ্য অঞ্চলের মহারাষ্ট্রের আদিবাসীরা (প্রায় তিন হাজার) 'সংঘর্ষ যাত্রা'য় সম্মিলিত হয় আলিরাজপুরে। এরা তিন চার দিন হাঁটা পথে আলিরাজপুরে পৌছয়। সাথে ডাল রুটি নিয়ে, রাস্তায় গান, পথসভা ও নাটক করতে করতে 'যাত্রা' এগোতে থাকে। ফাটা'র রাত্রিসভা চলাকালীন জোবট পরিযোজনাতে আক্রান্ত গ্রামবাসীরা আন্দোলনে সামিল হয়।

31শে ডিসেম্বর ছ' হাজার আদিবাসী-কৃষক চাঁদপুর থেকে কিছুদূরে মধ্যপ্রদেশ-গুজরাত সীমান্তে পৌছায়। সানে গুজরাতের পুলিস বাহিনী ও সরকারী খরচে আসা 'গুজরাতবাসী' দাঁড়িয়ে রয়েছে। গুজরাত সরকার 'সংঘর্ষ যাত্রার' সামনে গুজরাতের লোকেদের দাঁড় করিয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিতে চায়।

আমনে সামনে

গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেল সরকারী প্রচারযন্ত্র, প্রশাসন ও পুলিসকে কাজে লাগিয়ে, মিথ্যা প্রচার ও বদনাম দিয়ে প্রান্তীয়বাদকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করে ও বিকৃত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। মনে হচ্ছিল 'সংঘর্ষ যাত্রা' একটি বিদেশী বাহিনী ও গুজরাত-মধ্যপ্রদেশ সীমা এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমা। ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি, চেম্বার অফ কমার্স, ট্রান্সপোর্ট এ্যাসোসিয়েশন, সহকারী ব্যাঙ্ক, স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়, নর্মদা ফাউণ্ডেশন, নর্মদা সমর্থন অভিযান সমিতি, সবাই মিলে 'সংঘর্ষ যাত্রা'কে আটকাবার দায়িত্ব নেয়। বাঁধ সমর্থকদের অনেককে শহর থেকে লাক্সারী বাসে আনা হয় ও পৌছানো হয়। ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে অনেকে সাদা পোষাকে পুলিসও ছিল। বাঁধ বিরোধী যাত্রা গুজরাতের মানুষের বিরোধে নয়। তাছাড়া বাঁধের সমর্থনে আন্দোলন করার অধিকারও রয়েছে। তবে এই আন্দোলন কখনো বাঁধ বিরোধীদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নয় অথবা বাঁধ বিরোধীদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করা উচিত নয়। বাঁধ সমর্থকরা বাঁধ বিরোধীদের সাথে কথা বলতে অস্বীকার করে। 40 ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর 25 জনের একটা দল পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় গুজরাতে প্রবেশ করে। এখানে গুজরাত সরকার 144 ধারা জারী করে। পরপর দুদিন লোকে গুজরাত সীমা পার হয়। রাতের অন্ধকারে 140 জন সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করে। 3রা জানুয়ারী রাতে এসব ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে নীমাড়বাসীরা 24 ঘণ্টা অনশন করে। 5ই জানুয়ারী বাবা আমতে সহ 28 জন নীমাড়বাসী প্রতিনিধিরূপে গুজরাত সীমায় প্রবেশ করে। মহিলা হোমগার্ড দ্বারা বাবা আমতেকে আটকানোর চেষ্টা হয়। পরে গুজরাতের 'জনতা' ওঁকে আটকায়। 25 দিন রাত-দিন মাইকে গান বাজিয়ে ও তীব্র আলো জালিয়ে বাবা আমতে সহ অন্যান্যদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। মুখ্যমন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী উর্মিলা বেন-এর নেতৃত্বে এসব চলতে থাকে। 7ই জানুয়ারী '91 মেধা পটকর সহ 7 জন অনিশ্চিতকালীন অনশন শুরু করেন। বিহারের গণআন্দোলনের সাথে যুক্ত মেঘনাদ, নর্মদা ঘাটীর খাজা ভাই, মাথুর ভাই, লক্ষী বাই, শান্তি বাই, দেওরাম ভাই ও একসাথে অনশন শুরু করে। 'সরদার সরোবর বিরোধী আন্দোলনকে এক নৈতিক স্তরে নিয়ে যাওয়া ও দেশবাসীর বিবেকের কাছে আহ্বান জানানো' এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল। এই অনশন গান্ধীবাদী অহিংসক সত্যাগ্রহের এক সবচেয়ে বড় মিশাল। এই আন্দোলনে সারা দেশের বুদ্ধিজীবিরা অভিভূত হন ও সরকারের কাছে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানান। গুজরাতের প্রসিদ্ধ সমাজকর্মী মধুসূদন মিস্ত্রি, জ্যোতি ভাই দেশাই, অশোক চৌধুরী, বালাজী ভাই পরমার, ঠাকুরভাই শাহ আন্দোলনকে সমর্থন জানান। প্রফেসর হর্ষদ দেশাই বলেন, "যে শক্তি আজ আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করছে তারাই গুজরাতের গরীব লোকেদের আন্দোলনকে দমন করে।"

সরকারের অনমনীয় মনোভাব

একদিকে হাজার হাজার লোক ধরনা, অনশন করছিল, অন্যদিকে সারা দেশের অনেক বুদ্ধিজীবি, বিশেষজ্ঞ, ন্যায়বিশারদ সরকারকে আন্দোলন-কারীদের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছিল। ভারতবর্ষের আদিবাসী সংগঠনের যে 500 মানুষ রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে 27শে ডিসেম্বর '90 থেকে ধরনা দিচ্ছিল, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাদের, প্রতিনিধিরা দেখা করে। ভারতের অনুসূচিত ও গণজাতির কমিশনার ডাঃ বি ডি শর্মা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের রাজ্যপালদের চিঠি লেখেন ও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তিনি বলেন 'সংঘর্ষ যাত্রা'র জন্য দেশের সংবিধানের সংকট দেখা দিয়েছে। সরকার ও আদিবাসীদের মধ্যে লড়াই বাঁধার উপক্রম দেখা দিয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলতে বলেন। কিন্তু গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশ সরকার কথা বলতে অস্বীকার করে।

প্রসিদ্ধ জলবণ্টন বিশেষজ্ঞ ডাঃ কে আর দাত্বে, 'পানী পঞ্চায়েত'-এর প্রবর্তক বিলাসরাও সালুখে, সমাজবাদী নেতা ভাই বৈদ্যও চেষ্টা করেন। এঁরা প্রধানমন্ত্রী, গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন ও গুজরাতের জলসমস্যার সমাধানের রাস্তা খোঁজার পরামর্শ দেন।

ন্যায়বিদ কৃষ্ণ আয়র, পত্রকার নিখিল চক্রবর্তী ও রাজনীতিবিদ পি এন হকসর রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লেখেন।

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সতীশ ধাওয়ান, এ কে এন রেড্ডী-ও চেষ্টা করেন; গুজরাতের গান্ধীবাদী নেতা চুনাভাই বৈদ্য, বোম্বাই-এর উদ্যোগপতি দামজী ভাই, সর্বোদয়ী নেতা ঠাকুর দাস বাঙও চেষ্টা করেন। গুজরাতের 'সর্বোদয়ী মণ্ডল' অনশন সমাপ্ত করার জন্য ও গুজরাত সরকারকে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী, পীযুষ টিরকী, রামবিলাস পাসোয়ান-ও আন্দোলনকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারকে কথা বলার অনুরোধ করেন। প্রবীন সাংসদ চিত্ত বসু সংসদে নর্মদা মামলা ওঠান। ঝাবুয়ার সাংসদ দিলিপ সিংহ ভুরিয়াও চেষ্টা করেন। এরা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের জনতা দল নেত্রী মৃণাল গোরে, বঁধুয়া মুক্তি মোর্চার স্বামী অগ্নিবেশ, টিহরী বাঁধ বিরোধী নেতা সুন্দরলাল বহুগুনাও অনর্থক প্রয়াস করেন।

কিন্তু গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী রূপ একই থাকে। মাঝে 17ই জানুয়ারী গুজরাতের মুখ্য সচিবের সাথে চর্চা হয়।

কিন্তু আন্দোলন দ্বারা যে সমস্ত বুনিয়াদী সমস্যা ওঠানো হয়েছে তার উপর তিনি চর্চা করতে অস্বীকার করেন।

জনতা জেগে ওঠো…

এই সময়ে নর্মদাঘাটীর গ্রামে গ্রামে লোকেরা সরকারের বিরুদ্ধে রোষ ব্যক্ত করে ও বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো মজবুত করার শপথ নেয়। 24শে জানুয়ারী নর্মদা ঘাটীতে সবার বাড়ীতে 'উনুন বন্ধ' ও 25 তারিখে বড় রাস্তা অবরোধ করা হয়। 25 তারিখ বড়আনীতে পুলিস দু'বার লাঠিচার্জ করে ও বড়আনীতে দু'দিনের হরতাল হয়। গ্রাম গ্রাম থেকে লোকেরা 'সংঘর্ষ' গ্রামে আসতে থাকে ও 'সংঘর্ষ'কে আগে বাড়াবার সংকল্প নেয়। সারা দেশের বুদ্ধিজীবি ও বিভিন্ন সংগঠন মেধা পাটকরও সংঘর্ষ সাথীদের বলেন, "সংঘর্ষ যাত্রার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।" 'সংঘর্ষ যাত্রা' সবাইকে দেখিয়ে দিল যে নর্মদা ঘাটীর লোকেরা শুধুমাত্র সরদার সরোবরের বিরুদ্ধে নয়, তারা যে কোন রকম অসম বিকাশের বিরুদ্ধে। এইজন্য সরদার সরোবরের পুনর্বিচার দেশবাসী মঞ্জুর করছে। সময় এলে বাঁধ বিরোধী আন্দোলনে তারা নিজেরাই ভাগ নেবে।

28শে জানুয়ারী 1991 দেশের তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি দ্বারা বাঁধের আর্থিক লাভক্ষতি, নির্মাণ পদ্ধতি ও বিশেষভাবে উদ্বাস্তুদের মানবিক দিকগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করা হবে। এঁরা হলেন ন্যায়বিদ কৃষ্ণ আয়র, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান সমিতির অধ্যক্ষ যশপাল ও প্রাক্তন মহালেখা প্রবন্ধক, টি এন চতুর্বেদী।

28শে জানুয়ারী অনশন ভঙ্গ হয়। 30শে জানুয়ারী মেধা পটকর বলেন, "21 দিন অনশনের পর 21 গুণ ক্ষমতা নিয়ে নর্মদাঘাটীর আদিবাসী ও কৃষক সংঘর্ষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে"।

নর্মদাঘাটীতে আন্দোলন চলছে। সরকারের সাথে আর কোনরকম কথাবার্তা নয়। একশ গুণ ক্ষমতা দিয়ে সেখানকার মানুষ আত্মরক্ষা করবে।

সরকার দেশের অন্যান্য জায়গায় আন্দোলনকে দমন করার নীতি, নর্মদাঘাটীতে চালাচ্ছে। নর্মদাঘাটী এই নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তৈরী রয়েছে।

—শৈবাল

নর্মদা উপত্যকা প্রকল্প ঘিরে মধ্যপ্রদেশের মানুষের কাছে একটি আবেদন ঃ বাবা আমতে

নর্মদার উপরে প্রস্তাবিত ইন্দিরা সাগর ও সর্দার সরোবর বাঁধ মধ্য-প্রদেশের মানুষ তথা গোটা জাতির জন্য যে গভীর ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য বিপদ সৃষ্টি করবে তা বুঝতে মধ্যপ্রদেশ সরকার ব্যর্থ হয়েছে। সত্যিই এ হল এক প্রকাণ্ড ট্রাজেডি। নর্মদা প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে অভিমতকে আমরা সাজিয়েছি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে গ্রথিত যুক্তি ও বিশ্লেষণ দিয়ে। একে, আমাদের দেশে যতগুলি প্রকল্পর বিরুদ্ধে মতামত দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে, সেরা বলা যায়। এই মতামত তৈরী করেছেন অ্যাক্টিভিস্ট, পরিবেশবিদ, যন্ত্রবিদ ও বিজ্ঞানীরা। ভারতবর্ষর নানান অঞ্চলের এই সব মানুষেরা নর্মদা প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন যুক্তিপূর্ণ ও মানবিকভাবে। নর্মদাকে ঘিরে এক শক্তিশালী ও শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলন এগিয়ে এসেছে মধ্যপ্রদেশে।

এত কিছু সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ সরকার আমাদের আন্দোলনের প্রতি এক চরম অমানবিক, অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক মনোভাব নিয়েছে। খালঘাট সেতুর ঘটনার পর দেওয়া 6ই মার্চের প্রতিশ্রুতি সরকার পালন করে নি। না সরকার আমাদের সাথে কথা বলেছে, না কেন্দ্রকে গোটা প্রকল্পর পূর্ণ মূল্যায়ণের জন্য চিঠি লিখেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 6ই এপ্রিল দিনটিকে বেছে নিই জাতীয় প্রতিবাদ দিবস হিসেবে। ওই দিনটিতে নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপর বাড়ওয়ানি (পশ্চিম নিমার) ও আলিরাজপুরে (ঝাবুয়া) পুলিশ কোন প্ররোচনা ছাড়াই যে বর্বরোচিত ও হঠকারি হিংসার আশ্রয় নেয় তা আমাদের অতীত ঔপনিবেশিক প্রভুদেরও লজ্জা দেবে। ধর্ণায় বসে থাকা মানুষদের উপর ঘোড়ায় চড়া পুলিশ চাবুক এবং লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। আলিরাজপুরের আদিবাসিদের উপর এই কাপুরুষোচিত হামলা, আমরা যে গণতন্ত্রে বাস করি তা বিশ্বাস করাও কঠিন করে দেয়। এই হামলায় এমন কি নারী ও শিশুদেরও ছাড় দেওয়া হয় নি।……

নর্মদা উপত্যকার মানুষদের পক্ষ থেকে আমি মধ্যপ্রদেশ সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই। আমি বলতে চাই সংঘর্ষর পথ ছাড়ুন। আইনী বৈধতার কূটকচালীর আশ্রয় নেবেন না। আমার দেশের মানুষের উপর কোন অমানবিক আইনই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। গত দশ বছরে সম্পূর্ণ নতুন সব তথ্য, গবেষণা আর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আজ নর্মদা ট্রাইবুন্যালস্, অ্যাওয়ার্ডের এক সামগ্রিক পুনর্মূল্যায়ন দাবী করছে। এখনই ইন্দিরা সাগর ও সর্দার সরোবর প্রকল্পর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কাজ বন্ধ না করলে কোন অর্থপূর্ণ পুনর্মূল্যায়ণ সম্ভব নয়। এবং কোন সঠিক বিকল্পও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নর্মদা প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তিগুলি হল ঃ

(1) **প্রযুক্তিগত ঃ** নর্মদা জলপ্রবাহর সাম্প্রতিক এক সরকারি হিসেবই প্রকল্পগুলির প্রযুক্তিগত ধারণার ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিয়েছে। প্রকল্পগুলি যে সময় ডিজাইন করা হয়েছিল 'রাণ অফ' এখন তার থেকে 42 লক্ষ একর ফুট কমে গেছে। কাজেই যে তথ্যর উপর দাঁড়িয়ে নর্মদা ট্রাইবুন্যাল তার 1979 সালের রায় দিয়েছিল এখন আর তা বৈধ না, এবং পুরোপুরি টেকনিক্যাল কারণেই প্রকল্পগুলির পূর্ণমূল্যায়ণের পক্ষে কাটা যায় না এমন যুক্তি আছে।

(2) **পদ্ধতিগত:** সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলে প্ল্যানিং কমিশন তার নিজস্ব যে নির্দেশাবলি দিয়েছে নর্মদা প্রকল্পর ছাড়পত্র তা চরম ভাবে লঙ্ঘন করেছে। সপ্তম পরিকল্পনায় একটি বাধ্যতামূলক শর্ত হল যে খরাপ্রবণ, আদিবাসি ও পিছিয়ে পড়া এলাকার সেচ-ক্ষেত্রে নতুন প্রকল্পগুলি মাঝারি মাপের মধ্যে রাখা উচিত। এই দলিল বলেছে, যে তৈরী হয়ে যাওয়া সেচ প্রকল্পগুলির ব্যবহারের উপর সব থেকে বেশী জোর দিতে হবে। জোর দিতে হবে তৈরী হতে থাকা প্রকল্পগুলি শেষ করার উপর। সপ্তম পরিকল্পনা আরও বলেছে যে ক্ষুদ্র সেচে আমাদের অনেক বেশী জোর দেওয়া উচিত।

(3) **আর্থিক:** 1988-89 সালে জলসম্পদ মন্ত্রকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী এখনও কাজ শেষ হয়নি এরকম 181টি বড় জলসেচ প্রকল্পকে সপ্তম পরিকল্পনায় চালান করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলিকে শেষ করতে আনুমানিক 26,270 কোটি টাকা লাগবে। সপ্তম পরিকল্পনায় গোটা দেশের বড় ও মাঝারি প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ হল 11,556 কোটি টাকা। এ হল 26,270 কোটির আর্ধেকেরও কম! এর থেকেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত যে নতুন কোন বড় প্রকল্প অনুমোদন করা আর্থিক দিক থেকে অসম্ভব এবং অবাস্তব। এমন কি কাজ চলছে এমন প্রকল্পগুলি শেষ করবার পয়সাও আমাদের নেই। এই অবস্থায় সর্দার সরোবর এবং ইন্দিরা সাগর প্রকল্পগুলির জন্য 13,000 কোটিরও বেশী টাকা অনুমোদন করার অর্থ হল এক অন্তহীন চক্র ; টাকা পয়সার অভাব···কাজ শেষ হতে দেরী···খরচ বেড়ে যাওয়া···বাড়তি আর্থিক চাপ···আরও দেরী হওয়া···ফলত মধ্যপ্রদেশের ঘাড়ে এক বিরাট আর্থিক বোঝা এসে যাওয়া।

কোন রাস্তাই নেই মধ্যপ্রদেশের ইন্দিরা সাগরের জন্য 2,167 কোটি টাকা তোলার পাশাপাশি সর্দার সরোবরের জন্য 1124 কোটি টাকা (সি সি প্যাটেল, 1988) ঠিক সময়ের মধ্যে তোলার। এখনই মধ্যপ্রদেশে কত প্রকল্প মূলত: প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে শেষ করা যাচ্ছে না। নর্মদার উপর বড় বড় প্রকল্পে খাল কাটার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। যেমন তাওয়া, বার্ণা ও বার্গি। এইসব প্রকল্পর কাজ আগে শেষ করাই কি অনেক বেশী সুবুদ্ধির কাজ হবে, না কি অনেক প্রকল্পে একটু একটু করে টাকা ছড়িয়ে আমাদের বিনিয়োগের কার্যকারিতাকে (এফিসিয়েন্সী) কমিয়ে আনা হবে?

(4) **জলে ডোবার দাম:** এই সব টাকাকড়ির ব্যাপার ছাড়াও নর্মদা প্রকল্পগুলি বিশেষভাবে মধ্যপ্রদেশের উপর জল নিমজ্জনের এক অসহনীয় বোঝা চাপিয়ে দেবে। ইন্দিরা সাগর মধ্যপ্রদেশে জলে ডুবিয়ে দেবে 91,348 হেক্টর জমি, যার মধ্যে 44,363 হেক্টর হল চমৎকার মানের কৃষি জমি এবং 42, 322 হেক্টর হল বনাঞ্চল। এ ছাড়া সর্দার সরোবর ডোবাবে 39,134 হেক্টর। যার মধ্যে কৃষি জমি হল 11,318 হেক্টর এবং বনাঞ্চল হল 13,744 হেক্টর। এর বেশীর ভাগটাই পড়ছে মধ্যপ্রদেশে। সুতরাং এক অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে মধ্যপ্রদেশ হাজার হাজার কোটি টাকা খরচা করে এত জমি জলের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে যা কিনা ইন্দিরা সাগরের জলে সেচ হওয়া জমির (1·23 লক্ষ হেক্টর) থেকে আয়তনে বেশী। আসলে ইন্দিরা সাগরের প্রধান উদ্দেশ্য সর্দার সরোবরের জন্যে জল ধরে রাখা, মধ্যপ্রদেশের জন্য কোন বড় উপকার করা নয়। এ রকম এক পরিস্থিতিতে এটা কি খুবই যুক্তিপূর্ণ নয় যে মধ্যপ্রদেশের মানুষ হাতে হাত মিলিয়ে এই সব প্রকল্পর সবকিছুর ব্যাপারে গোড়া থেকে আবার ভেবে দেখার দাবী তুলবে?

(5) **জল জমা এবং জমি নোনা হয়ে যাওয়া:** আর একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল ইন্দিরা সাগর যে জলসেচের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে তা কি বাস্তবে মধ্যপ্রদেশের কৃষকদের সাহায্য করবে। ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এক গবেষণায় দেখিয়েছে যে মাটির প্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের ধরণ অনুযায়ী ইন্দিরা সাগরের কমাণ্ড এলাকার 40 শতাংশ জলে ডুবে যাওয়া ও লবণাক্ত হয়ে যাওয়ার গভীর বিপদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। অবশ্যই ধরে নেওয়া হয়েছে প্রকল্প-কর্তারা যে রকম ধাঁচের কৃষি কাজের ছবি দেখতে পাচ্ছেন বাস্তবে সে রকমটাই ঘটবে। কিন্তু বড় প্রকল্পগুলির অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। ভারতে বড় মাপের প্রকল্পগুলি দেখিয়েছে পরিকল্পনার তুলনায় বাস্তবে কৃষি-কাজ অনেক বেশী জল-নির্ভর। অন্য দিকে ব্যাঙ্গালোর রিপোর্ট সম্পূর্ণরূপেই সর্দার সরোবর প্রকল্পর জলাধার কিভাবে ইন্দিরা সাগরের কমাণ্ড এলাকায় গভীর ভাবে আঘাত হানবে সেই ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন সেচ-সচিব, শ্রী আর এল গুপ্তাও এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীগুপ্তার মতে জল জমার থেকে মুক্তি প্রায় অসম্ভব এবং ইন্দিরা সাগর কমাণ্ড এলাকার অধিবাসিরা কখনও কখনও জলে ডোবার যন্ত্রণায় কষ্ট পাবেন। যার জন্য দায়ী হবে সর্দার সরোবর জলাধারের চাপ। আর ইন্দিরা সাগর জলাধার এর ফলে তাওয়া কমাণ্ড এলাকায় জলে ডোবার সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলবে।

(6) **পরিবেশ বিপর্যয়:** ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ইন্দিরা সাগর প্রকল্পর জন্য বনাঞ্চল ধ্বংসর পরিবেশগত মূল্য এক অবিশ্বাস্য 30,923 কোটি টাকা, যেখানে সর্দার সরোবরের জন্য এই মূল্য 8,190 কোটি টাকা। 'খরচ বনাম উপকারের' বিশ্লেষণের মধ্যে এই দাম ধরলে দেখা যায় যে দুটি বাঁধই প্ল্যানিং কমিশনের বাধ্যতামূলক নূন্যতম চাহিদা পূরণ করে নি। তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ দপ্তরের বন-সংরক্ষণ পরামর্শদাতা কমিটি কিছুদিন হল ইন্দিরা সাগরের কাজ বন্ধ করার দাবী করেছে। কারণ কাজ পরিবেশ মন্ত্রকের নির্দেশাবলি মেনে হচ্ছে না। একবারে আট কোটি গাছ কেটে ফেললে পরে পরিবেশে যে ভয়ঙ্কর অসাম্য দেখা দেবে সে সম্ভাবনায় পরামর্শদাতা কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কমিটি বলছে 'গোটা এলাকার জলাবায়ু যাবে বদলে। বৃষ্টিচক্র বিঘ্নিত হবে এবং আবহাওয়ার অক্সিজেন আসবে কমে।'

(7) **ভূমিকম্পর বিপদ:** হোলকার সাইন্স কলেজ, ইন্দোরের পদার্থ

বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ রাম স্বরূপ শ্রীবাস্তবের মতে সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণ ওই এলাকায় ভূমিকম্পকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে, কারণ খুব কাছাকাছি গুজরাটের ভারুচ অঞ্চলে 3 কিমি গভীরে এক ভূমিকম্প সৃষ্টি-কারি কেন্দ্র রয়েছে। এটি এখনও সক্রিয় এবং সর্দার সরোবর বাঁধ একে জীবন্ত করে তুলবে। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমানিত হয়েছে যে সর্দার সরোবর প্রকল্পর দ্বারা জলমগ্ন এলাকার মধ্যেই তুটি আড়াআড়ি 'ফল্ট' এলাকা আছে। একটি বিসারপুর 'ফল্ট' অন্যটি আম্বাদোঙ্গার 'ফল্ট'। এগুলি 30 থেকে 40 কিমি চওড়া। শ্রীবাস্তব আরও বহু তথ্য দিয়েছেন যা যথেষ্ট প্রগাঢ় মনোযোগের দাবী রাখে। তাঁর মতে ইঞ্জিনীয়াররা ভূতাত্ত্বিক ফল্টগুলি পূরণ করতে বাঁধের ভিতে 25 লক্ষ টন সিমেণ্ট ঢেলেছেন কিন্তু জলাধার এলাকায় তাঁরা এমন কি এই ফল্ট কোথায় কোথায় আছে তাও খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন নি। আমার প্রশ্ন হল—সরকার যখন জানে যে এই বাঁধ দেশের মানুষের জন্য এক সর্বনাশা পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে তখন প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ছাড়াই কেন সরকার এত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে?

(8) **জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ধ্বংস :** সবশেষে এবং সব কিছুর ওপরে যে কারণে আমি ইন্দিরা সাগর ও সর্দার সরোবর প্রকল্পর বিরোধিতা করছি তার কারণ এর ফলে এক বিরাট মাপের ধ্বংসকার্য ঘটবে, জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক জীবনের। আমি সেই তিন লক্ষ মানুষের কথা বলছি যাঁরা এমন এলাকায় বসবাস করেন যা এই তুই প্রকল্প রূপায়িত হলে জলে ডুবে যাবে। ফলে তাঁরা ঘরবাড়ী হারিয়ে বাস্তুচ্যুত মানুষে পরিণত হবেন। এদের একটা বড় অংশ হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের যেখানে এর মধ্যেই নর্মদার উপর তৈরী তাওয়া এবং বার্গি প্রকল্পর ফলে ডুবে যাওয়া এলাকার 50,000 মানুষকে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হচ্ছে এবং তাঁদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। নর্মদা উপত্যকার মানুষ বহু বছর ধরে পুনর্বাসনের প্রশ্নে প্রত্যেক স্তরের সরকারি কর্মচারিদের সাথে কথা বলছেন এবং তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌছে গেছেন যে এমন কোন পুনর্বাসন অসম্ভব যা ন্যায্য এবং বিকাশমান হবে তা সে সরকার কাগজপত্রে যে নীতিই ঘোষণা করুক আর যে প্রতিশ্রুতিই দিক। সরকারি এজেন্সী (নর্মদা কন্ট্রোল অথরিটি, মিনিষ্ট্রি অফ এনভায়রণমেণ্ট অ্যাণ্ড ফরেষ্টস্) বা বিশেষভাবে নিযুক্ত উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান (সেণ্টার ফর সোস্যাল ষ্টাডিজ্—সুরাট, টাটা ইনষ্টিটিউট অফ সোস্যাল সাইন্স্—বম্বে এবং ন্যাশনাল সেণ্টার ফর হিউম্যান সেটেলমেণ্টস এ্যাণ্ড এনভায়রণমেণ্ট-ভূপাল) অথবা বিশ্ব ব্যাঙ্ক রিপোর্ট (সাম্প্রতিক মিশন রিপোর্ট অন এস এস পি রিসেটেলমেণ্ট-জুন 1983) নিশ্চিতভাবেই এই মতামতকে সমর্থন করে। আর এর মধ্যেই এই সব এলাকায় সব ধরণের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এসে ঠেকেছে শূন্যে। কারণ সবকিছুই অনির্দিষ্ট, সবকিছুই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে অন্তহীন সময় ধরে। আর জলে ডুবে যাওয়ার ভয় প্রেতের মত এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

আমলা আর রাজনীতিবিদদের তাঁদের বিবেককে চাপা দেওয়ার জন্য চমৎকার সব পুনর্বাসন নীতি খাতায় কলমে হাজির করা আর এক বিশাল প্রচার মাধ্যমের ভুলভাল ব্যবহারের সাহায্যে এগুলি নিয়ে নোংরা স্থূল চেঁচামেচি, এ হল এক ব্যাপার। আর অন্য দিক থেকে দেখলে তিন লক্ষ লোকের জীবন নতুন ভাবে শুরু করান আমাদের সরকারের সাধ্যের অতীত।

আমি এটাও যোগ করতে চাই যে 'প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের' তালিকাকে আরও বাড়াতে হবে। এর মধ্যে আসবেন নর্মদার জল ব্যবহারকারী মানুষেরা। যাঁদের মধ্যপ্রদেশের মধ্যে 200 কিমি অবধি বিস্তৃত সর্দার সরোবর জলাধারের জলে কোনই অধিকার থাকবে না। শত শত বছর ধরে লোকমাতার জলের ওপর এদের যে অধিকার সরকার কি তা কেড়ে নিতে চান?

9) **শক্তি উৎপাদনের প্রশ্ন :** কখনও কখনও নর্মদা প্রকল্পর ন্যায্যতা প্রমাণ করা হয় কৃষির জন্য 550 মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদনকে দেখিয়ে। প্রশ্ন হল যে বিশাল খরচ ও ঝুঁকির কথা আমরা প্রমাণ করেছি তা কি এই 550 মেগাওয়াটের যোগ্য দাম? বিশেষত যখন বিকল্পগুলি সামনে হাজির এবং স্পষ্টভাবেই তুলনায় সস্তা। কিছুদিন হল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সাইন্স—ব্যাঙ্গালোর, বিকল্প শক্তি সংক্রান্ত এক সামাগ্রিক সমীক্ষা শেষ করেছে। এই গবেষণা দেখিয়েছে যে প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া অন্যান্য কেন্দ্রীভূত উৎস (নিউক্লিয়ার, তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ) থেকে তৈরী শক্তির ইউনিট প্রতি খরচ বিকেন্দ্রীত উৎসর (ছোট, জলবিদ্যুৎ, জৈব গ্যাস, উৎপাদক গ্যাস প্রভৃতি) থেকে বেশী। এই অনুসন্ধানের আরও চাঞ্চল্যকর দিক হল শক্তি বাঁচিয়ে রাখার (এনার্জি কনসারভেশন) বিকল্পগুলি শক্তি উৎপাদনের তুলনায় উল্লেখযোগ্য-ভাবে সস্তা, বিশেষত যখন সে শক্তি তৈরী হচ্ছে কেন্দ্রীভূত উৎস থেকে। হাতের কাছে টাকা পয়সার জোর যত কমবে ততই এটা বেশী সত্যি হয়ে দাঁড়াবে। শক্তির যোগান ও চাহিদার যে গরমিল আজ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে তাকে ঠেকাবার জন্য এই গবেষণা কয়েকটি বিষয়কে বেছে নিয়েছে। এদের মধ্যে সবার উপরে আছে শক্তি বাঁচিয়ে রাখা অর্থাৎ সংরক্ষণ। তার পরেই আসে বিকেন্দ্রিত, বার বার ব্যবহার করা যায় (পুনর্ণবীকরণ যোগ্য) এমন উৎস এবং কেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক গ্যাস। এর পরেই জলবিদ্যুৎ, তাপবিদ্যুৎ সব শেষে নিউক্লিয়ার শক্তি (অমূল্য রেড্ডী ও অন্যান্যরা, 1990)। এই বিশ্লেষণ বলে যে নর্মদা বাঁধ থেকে তৈরী বিদ্যুৎশক্তি অন্য বিকল্পগুলির তুলনায় দামী হয়ে পড়তে পারে। এনভায়রনমেণ্টাল ডিফেন্স ফাণ্ডের গবেষণাও ঠিক এই সিদ্ধান্তেই পৌছেছে। এই গবেষণা দেখায় যে তিনটি শক্তি সংরক্ষণ প্রকল্প, যথা ঘনবদ্ধ ফ্লুরোসেণ্ট আলো, উন্নততর পাম্পসেট জলসেচের জন্য এবং শক্তিশালী মোটর একযোগে সর্দার সরোবরের তুলনায় তিনগুণ বেশী শক্তি এবং সাতগুণ বেশী কার্যক্ষমতা বের করতে পারে, এবং এখানে বিনিয়োগ

তুলনায় একটু কঃই হবে (পিটার মিলার, 1989, 'দি ইলেকট্রিসিটি কনজারভেশান অল্টারনেটিভ টু দ্যা সর্দার সরোবর ড্যাম')।

বিকল্প নর্মদা উপত্যকা জনবিকাশ পরিকল্পনা :

আমাদের আন্দোলন বিদ্যুৎশক্তি, জলসেচ ও পানীয় জলকে ঘিরে নর্মদা প্রকল্পগুলির এক সামগ্রিক বিকল্পর রূপরেখা তৈরী করেছে।

I) **অল্প জলের চাষ পদ্ধতির বিকাশ :** ভারতীয় কৃষিতে সবুজ বিপ্লব যে মূলতঃ এক গম-বিপ্লব (কিছু দূর পর্যন্ত চালের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি) তা আজ সবাই মেনে নিয়েছে। এটাও অনেকে মানেন যে এই বিপ্লব কেবলমাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলের মধ্যেই কাজ করেছে। আর তা পুরোপুরিই অবহেলার দিকে নিয়ে গেছে মোটা দানার শস্য, ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনকে। পাশাপাশি আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে সম্ভাব্য সমস্ত সেচশক্তি ব্যবহার করলেও দেশের চাষযোগ্য জমির একশ ভাগের চল্লিশ ভাগই সেচের জলের আওতার বাইরে থেকে যাবে (সি এম হনুমন্থ রাও ও অন্যান্যরা, 1988)। তাই অল্প জলের চাষ-পদ্ধতি আজ একান্তই ভীষণ জরুরী। প্রকৃতপক্ষে নর্মদা উপত্যকার বিশাল কালো মাটি অঞ্চলে (ব্লাক কটন সয়েল ট্রাক্ট) একগুচ্ছ উন্নত অল্প জলে চাষ পদ্ধতির প্রয়োগ বড় মাপের খাল কেটে জলসেচের তুলনায় অনেক বেশী উপযুক্ত হতে পারে। এই এক গুচ্ছ পদ্ধতির অংশ হবে এমন সব বীজ যা খরার প্রকোপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে সক্ষম, আর গাছের গোড়ায় দেওয়ার জন্য গোবর জাতীয় পদার্থ। থাকবে টুকরো টুকরো ফালি জমিতে চাষ (ষ্ট্রীপ ক্রপিং), যতটা সম্ভব অল্প লাঙল চালান, দুটো চাষের মধ্যেকার সময়ে সুবিধাজনক অন্য চাষ করা এইসব। এর পাশাপাশি সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে মোটা দানার শস্য আর জলের দাম চাষি ঠিকমত পায়। পাশাপাশি ছোট আর 'আরও ছোট' (প্রান্তিক—মার্জিনাল) চাষিকে দিতে হবে বাড়তি সুবিধে যাতে সে ভালভাবে বাজারে তার মাল বেচতে পারে। পুষ্টির দিক থেকেও মোটা দানার শস্য আর নানান ধরণের ডালের ওপর জোর দেওয়া আমার মনে হয় সঠিক কাজ।

II) **নির্দিষ্ট জায়গায় সম্পূর্ণ জল বিভাজিকার উন্নয়ন :** অল্প জলে চাষ পদ্ধতিতে সাফল্য পেতে হলে এবং দেশের অসংখ্য বড় ও ছোট নদী তথা মাটির তলার জলের উৎসকে পুনরায় সক্রিয় করে তুলতে হলে আমাদের সামগ্রিক নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে অবস্থান নির্দিষ্ট করে জলবিভাজিকার* উন্নতি করা যায়। এর মধ্যে বন তৈরী করা (যে অঞ্চলে যে গাছ উপযুক্ত সেই অনুযায়ী) কৃষি-বনাঞ্চল তৈরী (কৃষি এবং বন-অঞ্চল একই সাথে তৈরী করা এমন গাছ ও শস্য ব্যবহার করে যা মিলমিশ খায় এবং একে অন্যের পরিপূরক)। এগুলির সাথে ভূমিক্ষয় রোধ করার জন্য টেকনিক্যাল ব্যবস্থা, (যেমন ঢালের পাশ বরাবর বাঁধ দেওয়া, পরপর মাটির ধাপ বানান, ঘাস দিয়ে ছাওয়া জল বেরোবার রাস্তা তৈরী, জল চোঁয়ান গর্ত বন্ধ করার কাঠামো ব্যবহার ইত্যাদি) উদ্ভিদজাত পদ্ধতি, (ঘাস ছাওয়ান, চারণভূমি উন্নয়ন, বিশেষ ধরণের ভূমিক্ষয় নিরোধক শস্য রোপন ইত্যাদি) এবং জল ধারণ ব্যবস্থা (চেক্ বাঁধ, কৃষি-পুকুর এবং ছোট ছোট ফুটোর মধ্য দিয়ে ঝরান জলাধার)।

III) **ছোট সেচের স্থান সবার উপরে :** প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য অরুণ ঘোষ হিসাব করে দেখিয়েছেন যে প্রতি হেক্টর পিছু ছোট সেচের খরচ বড় সেচের দ'শ ভাগের এক ভাগ। অন্য অনেক বিশেষজ্ঞ এই খরচকে চার ভাগের এক ভাগ বলেছেন। অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন এই হিসাব কতটা নিখুঁত। এঁরাও কি অস্বীকার করতে পারবেন ছোট সেচের সবার উপরে স্থান পাওয়া উচিত। কারণ কোন প্রকল্পে লাগানর মত মূলধনের প্রবল অভাব, কারণ কাজ চলছে এমন প্রকল্পগুলি শেষ করার মত টাকা নেই। ছোট ছোট প্রকল্পগুলি নিয়ন্ত্রণ করা, পরিবর্তিত করা, অনেক সহজ। প্রকল্প ছোট হলে সেগুলি চালান—সারান এই সবের মধ্যে স্থানীয় মানুষের অংশ গ্রহণ সুবিধাজনক হয়। আর খরচ বেড়ে যাওয়া বা তৈরী করার জন্য বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও যায় কমে। আর হাতের কাছে পাওয়া সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ দেখায় যে তৈরী হওয়া শক্তির ব্যবহার ছোট প্রকল্পে হয় সব চাইতে ভাল মাপে। আমরা অবশ্য জলসেচের ক্ষেত্রে সরকারি টাকা পয়সা লাগানর ভূমিকাকে খাটো করছি না। আমরা বলছি যে এ ব্যাপারে একটা পরিবর্তন আসুক। টাকা-পয়সা লাগান হোক ছোট সেচের অনুকুলে।

IV) **ছোট বাঁধ :** আপনারা হয়ত জানেন যে নর্মদা উপত্যকা প্রকল্পকে বর্তমানে যে ভাবে ছকা হয়েছে তাতে (অন্তত কাগজে-কলমে) নর্মদা অববাহিকায় বেশ কয়েকটি ছোট বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, আসুন, এই দিকের বিস্তারিত প্রস্তাবগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সব থেকে আগে। আর দেরী না করে এগুলি বাস্তবায়িত করি।

ছোট বাঁধের বিরুদ্ধে কখনও কখনও যুক্তি দেওয়া হয় যে বড় বাঁধের তুলনায় এরা জলে ডোবায় মাত্রাছাড়া বিরাট এলাকা। এই ধরণের এক নিশ্বাসে বলে ফেলা সাধারণ মতামত কখনই প্রকৃত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রমাণ দিয়ে দাঁড় করান হয় না। যদি ছোট বাঁধগুলি ভৌগলিক দিক থেকে উপযুক্ত জায়গায় বেছে করা হয়, তবে এই ধরণের ঘটনা ঘটার কোন কারণই নেই। যা আরও গুরুত্বপুর্ণ তা হোল বড় বাঁধ অঞ্চলের মানুষের সম্পূর্ণ অস্তিত্বের ধ্বংস ঘটায়। কিন্তু ছোট বাঁধের ফলে এমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা অনেক কমে যায় কারণ এক্ষেত্রে বাস্তুচ্যুত অল্প মানুষকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এলাকার মধ্যেই পুর্নবসতি করান যায়।

---

*জলবিভাজিকা : দুটি নদীর মধ্যে যেখানে ভাগ হচ্ছে। ভুল করে এই শব্দটিকে জলাধার বা নদীর উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আর এক অর্থ : যে ঢাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

V) **সেচ ও পানীয় জলের জন্য লিফট স্কীম ঃ** জলসেচের পরিমাণ একই রেখে যদি জমি জলে ডোবা কমাতে হয় তবে আমাদের জলের স্বাভাবিক স্রোত ভিত্তিক জলসেচের বদলে জল তুলে সেচের উপর বেশী নির্ভর করতে হবে। 'লিফট জলসেচে' টাকা পয়সা খাটাতে হয় খাল কেটে জলসেচের তুলনায় কম। অথচ ফসল ফলার হার এখানে বেশী (চেম্বারস, 1988)। আমার দাবী নর্মদা উপত্যকায় 'লিফট জলসেচের' সম্ভাবনা নিয়ে এক সামগ্রিক গবেষণা চালাতে হবে। আমার আর একটা দাবী— মধ্য প্রদেশের গ্রাম এবং ছোট শহরগুলি তীব্র জলকষ্টর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের পানীয় জলের চাহিদা মেটানোর জন্য নর্মদা থেকে জল তোলার পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। কেবলমাত্র পশ্চিম নিমার জেলাতেই এ বছর মার্চ মাসের মধ্যে আমাদের কৃষকরা 70,000 পাম্পসেট বসিয়েছে নর্মদা থেকে জল তোলার জন্য। যে বিকল্পর কথা আমরা বলছি এ হল তার জীবন্ত উদাহরণ। মনে রাখা দরকার সর্দার সরোবর প্রকল্পর জলাধার তৈরী হলে কৃষকদের পক্ষে এই কাজ অসম্ভব করে তোলা হবে।

VI) **জলসেচ প্রকল্পগুলির উৎসকে ঠিক রাখা ঃ** ভারতে বড় বাঁধের ব্যার্থতার একটি প্রধান কারণ হল ডিজাইনে জলাধারে পলি পড়ার যে হিসেব ধরে কাজ করা হয় বাস্তবে পলি জমে তার থেকে অনেক বেশী গতিতে। ইরিগেশন কমিশনের (1972, Vol. 1, p. 326) রিপোর্ট অনুযায়ী এইসব প্রকল্পে পলি জমেছে খাতায় পত্রে হিসাবের প্রায় ছয়গুণ (579%)। এর ফলে প্রকল্পগুলির উপকারিতা ও জীবন সীমা দুইই গেছে কমে। এ দুটোকে বাড়াতে গেলে প্রকল্পগুলির উৎসে পরিশোধন করার জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। মধ্য প্রদেশে বিশেষ করে নর্মদার উপর তৈরী প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এটাই আজকের কাজ।

VII) **বড় জলসেচ প্রকল্পগুলির উন্নত পরিচালনা তথা রক্ষণাবেক্ষণ ঃ** বিশেষজ্ঞ রবার্ট চেম্বারস-এর মতে বড় বড় প্রকল্পগুলি পরিকল্পন মাফিক আমাদের কৃষকদের যত জল দেবে বলেছিল দিচ্ছে তার থেকে অনেক কম। এবং গুণগত দিক থেকে এই জল অনেক নীচু মানের। খারাপ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ হল এর কড় কারণ। এক্ষেত্রে গুণগত বলতে বোঝান হচ্ছে সময় মেনে জল দেওয়া, জল দেব বললে ঠিক ঠিক জল দেওয়া এবং দেওয়া জলকে ব্যববারের উপযোগী করে দেওয়া। এগুলো যদি উল্টোপাল্টা হয়ে যায় তবে কৃষকদের ক্ষতি হবে। চালু বড় বাঁধগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উন্নতি ঘটাতে এক বিরাট প্রচেষ্টা আজ খুবই প্রয়োজন।

VIII) **বড় মাপের জলসেচের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমিকে আবার ব্যবহারের জন্য ঠিক করে তোলা ঃ** সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে 60 লক্ষ হেক্টর চমৎকার মানের চাষের জমি জলে ডুবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষার বা লবণ জমে নষ্ট হয়েছে আরও 70 লক্ষ হেক্টর। এসব বাড়ছেই। এই সমস্যাকে আরও ভয়ানক হতে দেবার বদলে আমাদের উচিত এক বিশাল প্রয়াস শুরু করা যাতে এই সব জমি তাদের ফলন ক্ষমতা পুরো ফিরে পায়।

IX) **অসম্পূর্ণ জলসেচ প্রকল্পগুলি দ্রুত শেষ করা ঃ** নতুন বড় নির্মাণকার্যের দিকে যাওয়ার বদলে আমাদের নিশ্চিতভাবেই মধ্য প্রদেশের অসম্পূর্ণ জলসেচ প্রকল্পগুলির ভাল-মন্দ আবার ভেবে দেখা উচিত। এবং এদের মধ্যে যেগুলো নির্ভরযোগ্য ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হবে তাদের কাজ সবার আগে শেষ করতে হবে।

(X) **নির্মিত জলসেচ প্রকল্পর আরও উন্নত ব্যবহার ঃ** মধ্যপ্রদেশে জলসেচের শক্তির প্রায় অর্ধেক অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। এটা ঘটছে বিশেষত বড় প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে। এর মধ্যেই নর্মদার উপর আমরা তাওয়া, বার্ণা ও বার্গির মত বড় বাঁধ তৈরী করেছি। যাদের খালকাটার কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। নতুন কোন নির্মান কার্য্য হাতে নেওয়ার আগেই এদের কাজ শেষ করতে হবে।

(XI) **শক্তি বাঁচান, বিকেন্দ্রিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও কেন্দ্রীভূত প্রাকৃতিক গ্যাস কারখানা এই তিনটি উপাদানকে অনুকূলভাবে মেলাতে হবে ঃ** আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এইরকম এক নানান ব্যবস্থা মিলিয়ে ব্যবহার করা পয়সা বাঁচাবে, চলবে অনেকদিন এবং মধ্যপ্রদেশে নর্মদা প্রকল্প থেকে পাওয়া শক্তির তুলনায় পরিবেশকে পরিস্কার রাখবে।

(XII) **পরিকল্পনার ধারণা এবং প্রয়োগে জনগণের অংশগ্রহণ ঃ** আমাদের আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে আসা মতামত হল কোন পরিকল্পনা তা সে যতই ভাল করে রচনা করা হোক না কেন তার কোন গুরুত্বই নেই যদি না এর দ্বারা প্রভাবিত ও সম্পকিত মানুষ-জনের সক্রিয় অংশ গ্রহণে এটা তৈরী করা হয়।

এখনও সময় আছে মধ্যপ্রদেশ তথা গোটা দেশের মানুষকে এক পর্বত প্রমাণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানর। আমাদেরও বিকল্প হল মজবুত, সৃজন-ভিত্তিক বিকাশের পথ ধরে আজকের মানুষের জলন্ত সমস্যাগুলিকে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা। এই রাস্তার জন্য জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ সরকার পেতে পারে। আমি বুঝতে অক্ষম যে কেন মধ্যপ্রদেশ সরকার সংঘর্ষ ও ধ্বংসের পথ বেছে নিতে চলেছে।

আন্ত্রিক মহামারী 1990 / রিপোর্ট ঃ বীরভূম থেকে

[গ্রামের পথে ঢোল বাজিয়ে লোক জড়ো করছেন কয়েকজন মানুষ। না যাত্রা বা ভিডিও নয়, এঁরা এসেছেন ভয়ঙ্কর আন্ত্রিক মহামারীর সাথে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে। হাতে লেখা কাগজে, মুখের কথায়, মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলছেন আন্ত্রিক রোখার নানান উপায় নিয়ে। এ ছবি পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার গত বছর জুলাই মাসের। যাঁরা কাজ করেছিলেন সে সময়ে, তাঁদের সাথে কথা বলার ভিত্তিতে বিজ্ঞান চেতনার এক বন্ধু এটি তৈরী করে দিয়েছেন।—স. ম.]

এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে, জুলাই মাসের গোড়ার দিকে আন্ত্রিক ব্যাধির মহামারী ঝেঁটিয়ে গিয়েছে বীরভূম আর বর্ধমান জেলার বহু অঞ্চল। মারা গিয়েছেন অনেকেই এই ভয়ঙ্কর রোগের প্রকোপে, অনেকেই বিনা চিকিৎসায়। এই ভয়াল দিনগুলোর চিত্র খবরের কাগজের মাধ্যমে খানিকটা জানা গেছে।

কিন্তু মারী ও ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেননি এখানকার মানুষজন। অপ্রতুল ওষুধ আর ন্যূনতম সরকারি সহযোগিতা সম্বল করে বহু মানুষ সামিল হন এই মারী ও মরণের বিরুদ্ধে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করি লাভপুর থানার ঠিবা অঞ্চল।

আন্ত্রিক যখন নেমে এলো এই অঞ্চলের গ্রাম গ্রামান্তরে গোটা লাভপুর তখন বন্যা কবলিত। জলবাহিত এই রোগ আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র দ্রুত। একদিকে ক্ষমাহীন বন্যা অন্যদিকে নির্দয় মহামারী, অপ্রতিরোধ্য সাঁড়াশি আক্রমন।

গোটা ঠিবা এলাকায় ডাক্তার বলতে একজন বয়স্ক এল এম এফ, ডাক্তারী শাস্ত্রে তাঁর দখল এবং ওষুধের সরবরাহ দুটোর ঘাটতিই পাল্লা দিয়ে। নিকটতম হেল্‌থ সেন্টার (এইচ সি) একটি 8 কিমি অন্যটি 10 কিমি দূরে। একটি লাভপুরে, অন্যটি কীর্ণাহারে আর যাতায়াতের পথ জলপ্লাবিত। সেখানকার অবস্থাও তথৈবচ। ঠিবায় অবশ্য একটা সাবসিডিয়ারি হেল্‌থ সেন্টার আছে, আর তাতে চিকিৎসক বলতে একজন হোমিওপ্যাথ ও একজন ফার্মাসিষ্ট। হায়, জনদরদী স্বাস্থ্যনীতি!

5 জন মারা যান তখনো অবধি কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রিকসানারি কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা তো বাতুলতা। অবশ্য চিকিৎসা একদম হয়নি তা নয়। কিছু অখ্যাত হাতুড়ে ডাক্তার ঐ বিভীষিকার বাজারে দু পয়সা কামানোর উদ্দেশ্যে পারগেটিভ দিয়ে রোগীর ডিহাইড্রেসান বাড়িয়ে দেন।

এই অসহনীয় অবস্থায় প্রথম কাজ শুরু হয় 12-ই জুলাই নাগাদ। স্থানীয় কিছু বিচক্ষণ লোক উদ্যোগ নিয়ে এইচ সি-তে যোগাযোগ করেন। সেখানে থাকার মধ্যে মাত্র চার বোতল, হ্যাঁ মাত্র চার বোতল স্যালাইন আর অজ্ঞাত উপায়ে টিকে যাওয়া সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ।

কাজে নামার প্রয়োজন বুঝেছিলেন সবাই। এইচ সি থেকে দুজন ভলান্টিয়ার আর সর্বক্ষণের জন্য গরম জলের যোগান চাওয়া হয়।

পালা করে কাজে নেমে পড়েন বহুমানুষ। গোটা হেল্‌থ সেন্টার চত্বর পরিস্কার করা হলো রাতারাতি, যেটা বস্তুত একটা মারাত্মক রোগজীবাণু পূর্ণ আবর্জনা হয়েছিলো। অফিস তৈরী হলো সেই রাত্রেই। পঞ্চায়েতে বলে ওষুধ আর বিশুদ্ধ জলের ব্যবস্থা করা হলো খানিকটা। ইনডোর এবং আউটডোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। সদ্য আক্রান্তদের আউটডোর চিকিৎসা। মৃতপ্রায়দের জন্যে ইনডোরে গরম জল আর নুনের ব্যবস্থা করা হলো। প্রত্যেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন একজন রোগীও যাতে না মরে।

কমিটি তৈরী করা হলো, বিভিন্ন কাজের ভার দিয়ে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, নৌকা নিয়ে প্রচারে নেমে পড়লেন কর্মীরা। রোগের মূল কারণ সচেতনতা আর স্বাস্থ্যবোধের অভাব। কিভাবে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়া যায়, কি ব্যবস্থা নিলে রোগকে আটকানো যায়—লিফলেট, বক্তৃতা নানা ভাবে তাঁরা প্রচার চালালেন আশপাশের প্রত্যেকটি গ্রামে।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার, রাজনৈতিক ফয়দা নিরপেক্ষভাবেই রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন পাওয়া গেলো। বহু মানুষ এলেন তাঁদের মানবিক চেতনার জায়গা থেকে। ডাক্তার এলো সদর থেকে, যথেষ্ট পরিমান ওষুধ, হ্যালোজেন এবং স্যালাইন এসে পৌছলো। পঞ্চায়েত থেকে ডায়েট সরবরাহ করা হলো এবং তা চলেছিল অগাষ্টের প্রথম সপ্তাহ অবধি।

আর আনন্দের খবর এটাই যে, যেদিন থেকে কাজ শুরু করা হয় (অর্থাৎ 12-ই জুলাই) সেদিন থেকে ঐ এলাকায় আর কেউ আন্ত্রিকে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় নি। স্যালাইন খরচ হয়েছিলো মিনিমাম।

সাফল্যের কারণ হিসেবে একজন কর্মী বললেন যে, প্রচার হয়েছিলো খুব সর্বাঙ্গীন এবং তা গৃহিত হয়েছিলো সর্বত্র। শীতলা পুজা, দৈব এ সমস্ত ধারণার বিরুদ্ধে বলা হয়েছিলো জোরালো ভাবে। আর তার থেকেও বড় কারণ সবাই আন্তরিক দরদের সাথে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সাধারণ মানুষ —পঞ্চায়েত প্রশাসন সবাই যথাসাধ্য করেছেন, দলীয় সংকীর্ণতা ছিলো না।

একটু দেরিতে হলেও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের যোগান ছিলো যথেষ্ট। সিউড়ী সদরের প্রশাসন সত্যিই খুব সাহায্য করেছিলো সমগ্র প্রচেষ্টাকে।

উচ্চবিত্তদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ ছিলো না। এক হিসেবে দেখা যায় যে রোগাক্রান্তদের শতকরা 40—70 ভাগ গরীব ভূমিহীন কৃষক। বর্ণর দিক থেকেও নীচু বর্ণর মধ্যে রোগের প্রকোপ বেশী চোখে পড়েছে। এই রোগে মৃত্যুর মূল কারণ রোগ নয়, চিকিৎসার অভাব, পুষ্টির অভাব, শিক্ষার অভাব। জানতাম এদেশে লোকে অপুষ্টিতে মরে না, মরে অনাহারে। দেখলাম অপুষ্টিতেও মানুষ এদেশে মারা যায় আর তার কারণ সরকারী অবহেলা। পাশাপাশি বেঁচে থাকার লড়াই উজ্জীবিত করে আমাদের।

ক্যান্সারের রাজনীতি

[ভারতবর্ষে ক্যান্সার যে এক মহামারীর আকার নিচ্ছে তা ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাঁর আত্মীয়-বন্ধুরা এর শিকার হন তাঁরাই বোঝেন রোগীর কাছের মানুষদের উপর কি বিভীষিকাময় চাপ পড়ে ক্যান্সার হলে। এটাকে কি আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতই দেখব? সচেতন মানুষের এ ব্যাপারে কি করার আছে? চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিরই বা দায়িত্ব কতটুকু?

আমেরিকান জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের ফসল স্যামুয়েল এপস্টাইনের মূল লেখাটিতে উপরিউক্ত প্রসঙ্গগুলি ছাড়াও অন্য বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক আমাদের নজরে আনা হয়েছে। প্রশ্ন তোলা হয়েছে পুঁজি, রাষ্ট্রিয় নীতি এবং কল্যান সংস্থাগুলির ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে।

আমাদের দেশের বড় বড় শহরগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কারখানা দিয়ে ঘেরা ঝুপড়ির জগতে বাস করেন। রাসায়নিক সার, কীটনাশক পৌঁছে যাচ্ছে এমনকি বহু ভিতরের গ্রামেও। বড় বড় হাইওয়ের দুপাশে ছড়িয়ে পড়ে কালো মারণ ধোঁয়া। অথচ আমরাও কিন্তু এই বিষাক্ত বিপদকে দেখি বিচ্ছিন্ন করে। দোহাই দি ভাগ্যের, সেইদিক থেকে এই লেখা আমাদের ভাবাতে পারে।—স. ম.]

কিছু তথ্য ঃ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্যান্সার প্রায় মহামারীর পর্য্যায়ে পৌঁছেছে। একমাত্র 1987 সালেই নতুন করে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছেন 9 লাখেরও বেশী মানুষ, মারা গিয়েছেন 4·5 লাখ। 1930 সাল থেকে দিনকে দিন রোগ আক্রমণের আর মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে, সম্প্রতি বেড়েছে আরও বেশী। প্রতি তিনজনে একজন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন প্রতি চারজনে একজন করে মানুষ। ফুসফুস, স্তন, অন্ত্র, প্রস্টেট গ্রন্থি, শুক্রাশয়, মূত্রথলি চর্ম, প্রভৃতি অঙ্গের এবং রক্তজাত ক্যান্সারের হারও বাড়ছে।

বিগত কয়েক দশকে ক্যান্সার চিকিৎসার কিন্তু তেমন কোন উন্নতি হয়নি। চিকিৎসার সূচক হিসেবে ধরা হয় রোগ ধরা পড়ার পর পাঁচ বছর বেঁচে থাকার হার। এই হার একমাত্র জরায়ু-কণ্ঠ ও কয়েক ধরণের রক্তের ক্যানসার ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রেই বিশেষত প্রধান তিনটি মারক রোগ—ফুসফুস, স্তন ও অন্ত্রের ক্যানসারের ক্ষেত্রে একই থেকে গেছে। এই "সেরে ওঠার" হারও আবার সাদাদের ক্ষেত্রে 50 শতাংশ আর কালোদের ক্ষেত্রে 38 শতাংশ।

এখন পর্য্যন্ত জানা ক্যানসারের কারণ নানাবিধ—যথা ;

1) শিল্পজ রাসায়নিক পদার্থ

2) প্রাকৃতিক পরিবেশে ক্যানসার সৃষ্টকের উপস্থিতি—সূর্য্যালোক, এক্সটক্সিন ইত্যাদি

3) জিন ঘটিত সমস্যা

4) জীবন যাত্রার কুঅভ্যাস—ধূমপান (ফুসফুস), অতিরিক্ত চর্বি-জাতীয় খাবার (স্তন)

ক্যানসার ও শিল্পজ রাসায়নিক পদার্থ ঃ

আধুনিক দুনিয়ায় শিল্পে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটছে নতুন নতুন নানান রকম রাসায়নিক পদার্থ তৈরীর কারখানার, সামাজিক নিয়ন্ত্রনকে অনেক পিছনে ফেলেই। পেট্রোরাসায়নিক পদার্থ, ওষুধ, প্রসাধন, কীটনাশক, ধাতু নিষ্কাশন ইত্যাদি হরেক রকম কারখানার কাজ করতে করতে শ্রমিকদের ঘাটতে হচ্ছে হাজার হাজার ধরণের পদার্থ যার মধ্যে অনেকগুলিই শক্তিশালী ক্যানসার সৃষ্টক (Carcinogen)। চল্লিশের দশকে এই রকম রাসায়নিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বছরে এক বিলিয়ন পাউণ্ড, পঞ্চাশের দশকে তা হয় 30 বিলিয়ন পাউণ্ড, আর আশির দশকে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বছরে 400 বিলিয়ন পাউণ্ডেরও বেশী। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শ্রমিকেরা বিপদের মুখোমুখি হচ্ছেন। NIOSH বা ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর অকুপেশনাল সেফটি অ্যাণ্ড হেলথ আশঙ্কা করছেন যে প্রায় 10 মিলিয়ন শ্রমিক এখন 11টি অত্যন্ত শক্তিশালী ক্যানসার সৃষ্টক নিয়ে কাজ করছেন—বিশেষ কয়েকটি পেশার মানুষের মধ্যে রোগ আক্রমণের হার পাঁচ থেকে দশগুণ বেশী। এর সমর্থন মেলে বৃটিশ সূত্র থেকেও—ওপরের তলার তুলনায় সবচেয়ে নীচুতলার গরিব মানুষ (পুরুষ), যাঁরা এই ধরণের কাজই বেশী করেন, তাঁদের মধ্যে ক্যানসারে মৃত্যুর হার দ্বিগুণ।

পরিকল্পনা বিহীন ভাবে বিভিন্ন কারখানা থেকে ক্ষতিকর নানান পদার্থ ছড়ানো হচ্ছে বাতাসে—যা থেকে জলও দূষিত হচ্ছে। ঘিঞ্জি, শহুরে এলাকায় এরকম কারখানার আশেপাশে গড়ে উঠছে ক্যানসার রোগীর "চাক"।

আর এক বিপদ কারখানার ক্ষতিকর আবর্জনা নিষ্কাশন, নানান ধরণের আবর্জনাকুণ্ডের থেকে বিষাক্ত হচ্ছে মাটি—প্রায় রোজই কোন না কোন জনপদের মানুষ নতুন করে খুঁজে পাচ্ছেন তাঁদের বাসস্থানের কাছেই

মাটির তলায় আবর্জনাকুণ্ড—যা থেকে চুঁইয়ে পড়ে দূষিত হচ্ছে মাটির তলার জলও।

শক্তিশালী কীটনাশক, যথা উইপোকা মারার ওষুধ ক্লোরডেন/হেপটাক্লোর জাতীয় পদার্থের দূষণ এখনো চলছে ঘরে ঘরে— 15 বছর আগেই ক্যানসার সৃষ্টক হিসেবে চাষের কাজে ব্যবহার নিষিদ্ধ হবার পরেও।

আজ আমরা ক্যানসারের যে চেহারা দেখছি তা হচ্ছে পঞ্চাশ বা ষাটের দশক থেকে ক্রমাগত দূষণের ফল—যখন শিল্পজ রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন, ব্যবহারও বর্জন ছিলো এখনকার তুলনায় নগন্য। আসন্ন কয়েক দশক ধরে আগামী প্রজন্মকে এখনকার এই বিপুল পরিমাণ দূষণের ফল ভোগ করতে হবে। সেই আসন্ন ক্যানসার মহামারীর কল্পনাতেও আতঙ্কিত আজ সচেতন মানুষরা। এর জন্যে দায়ী কারা? দায়ী শিল্পপতিদের অপরিমিত মুনাফার বাসনা এবং নোংরা রাজনীতি।

শিল্পপতি ও ক্যানসারের রাজনীতি :

নতুন নতুন গজিয়ে ওঠা শত শত এইসব কারখানার মালিকদের শ্রমিক বা আশপাশের মানুষদের স্বাস্থ্য বা পরিবেশ রক্ষা নিয়ে মাথাব্যথা নেই—মুনাফা লুটছেন তাঁরা আর দূষণের ভার চাপছে সমাজের কাঁধে। দুর্বল সরকারী নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিন্তু তাঁরা পারেন সংঘবদ্ধ, শক্ত প্রতিরোধ হানতে। ওষুধ, কীটনাশক আর খাবারে মেশানোর জিনিষ ছাড়া অন্য কোন রাসায়নিক বাজারে ছাড়ার আগে পরীক্ষা করে দেখার কোন আইন ছিলইনা এতদিন। অনেক টালবাহানার পরে 1976 সালে চালু হয় দূষিত পদার্থ নিয়ন্ত্রণ আইন। কার্টারের আমলে চেষ্টা করা হয়েছিল "পেশাগত ক্যানসার সৃষ্টক" রাসায়নিক পদার্থের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে—বড় বড় কয়েকটি শিল্পে বিশেষ কয়েকটি কারিগরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে প্রাকৃতিক সম্পদকে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। যাই-হোক, এই নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে কিন্তু দেখা গেল ছোটবড় সব শিল্পপতিদেরই এক রা! ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিস্ট এসোসিয়েশন এর বিরোধিতা করার জন্যই গঠন করল আমেরিকান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হেলথ কাউনসিল।

নিয়ন্ত্রন ঠেকানোর কায়দাগুলো বেশ মজার :

1) মানুষের উপর উৎপাদিত পদার্থটির প্রভাব বা খরচ/লাভের অনুপাত সম্বন্ধে মনগড়া তথ্য দাখিল করা। এদের রেকর্ড এতই ভালো যে কোন শিল্পমালিকদের তরফ থেকে দেওয়া তথ্য, আবার পরীক্ষা করে না দেখা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে ভুল বলে ধরে নেওয়া যায়।

2) হয়ত কোন রাসায়নিক পদার্থের প্রাণীর উপরে ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আবিষ্কৃত হল। যখনই ঐ বিশেষ পদার্থটির ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রন চাইলেন কোন পরিবেশ সচেতন জনগোষ্ঠী বা শ্রমিকসংঘ তখনই এঁরা তা চ্যালেঞ্জ করে মানুষের উপরে ঐ বস্তুটির দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য দাবি করেন। নিউইয়র্কের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে গবেষকরা প্রাণীর উপরে ক্যানসার সৃষ্টক এরকম 100টি রসায়নিকের তালিকা পাঠান 80টি প্রধান রাসায়নিক শিল্পের কারখানায়। জানতে চাওয়া হয় যে মানুষের উপরে এইগুলির দীর্ঘকালীন কুফল সম্বন্ধে কোন সমীক্ষা তাঁরা করেছেন, করছেন বা করবেন কি না, যদি না করেন তবে কেন নয়। বেশীর ভাগেরই উত্তর এলো : এরকম কোন সমীক্ষা তাঁরা করেননি : এবং করতে চানও না। অজুহাত বিভিন্ন—যথা নানা অসুবিধে, অবাস্তব চিন্তা, খরচ বেশী, তাছাড়া তাঁদের বিশ্বাস (!) যে ঐসব রাসায়নিকগুলি তেমন ক্ষতিকর নয়। অদ্ভুত কৌশল! মানুষের উপর পরীক্ষিত তথ্য নেই বলে প্রাণীর উপরে পরীক্ষার ফলকে বাতিল করা হল, আবার মানুষের উপর সমীক্ষা চালাতে দেওয়াই হল না নানান অজুহাতে, সুতরাং ঐ পদার্থের ব্যবহার চলতেই থাকল।

(3) "ধূমপানের ঢালের আড়াল" হল আর এক বিশেষ কায়দা, অর্থ ও প্রভাব পুষ্ট বৈজ্ঞানিক মহলকে দিয়ে ধূমপানকেই ক্যানসারের সবচেয়ে বড় কারণ বলে প্রচার করা যাতে করে এই ঢাকের বাজনার আড়ালে চাপা পড়ে যায় নিজেদের দোষ।

(4) যদি একান্তই ঠেকানো না যায় তবে ঐ নিষিদ্ধ বস্তু বা নিষিদ্ধ কারিগরী ব্যবস্থা কম উন্নত দেশে চালান করা।

শিল্পপতিদের সমর্থনে আছেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, জনসংযোগ প্রতিষ্ঠান, কয়েকজন তাঁবেদার বৈজ্ঞানিক, যাঁরা পত্রপত্রিকায় এদের সপক্ষে প্রচার করেন কংগ্রেসের বৈঠকে, রাষ্ট্রের উপদেষ্টা কমিটি গুলিতে, নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে শুনানীর সময় এদের পক্ষ নেয়। এমন কি এদের পক্ষে ছিলেন স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রতি রেগন।

রেগন তো মতাদর্শগত ভাবেই নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে ছিলেন এবং দরকার হলে আইন ভেঙেও তিনি ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন এই মতাদর্শ (!) রূপায়ণের জন্য। কী করেননি তিনি! সরকারী নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোতে অর্থবরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া, অযোগ্য নিজের আদর্শে বিশ্বাসী লোককে উঁচুপদে বসানো, খরচ বেশী এই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা, শিল্পপতিদের সাথে বেআইনি রুদ্ধদ্বার বৈঠক করা, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আমলা তথা হোয়াইট হাউসের অঙ্গুলি হেলনে চলতে বাধ্য করা,—ধোঁয়াটে আইনের পছন্দমত ব্যাখ্যা করে ক্যানসার সৃষ্টক খাবারে মেশানোর পদার্থকে বাজারে ছাড়তে অনুমতি দেওয়া—এক কথায় নিয়ন্ত্রণ ঠেকানোর জন্য যা যা করার দরকার তা সবই তিনি করেছেন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—'84 সালে NIOSH 2 লাখ শ্রমিককে সন্ত্ব জানা গেছে এমন কয়েকটি শিল্পে ব্যবহৃত ক্যানসার সৃষ্টক পদার্থের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য 1.3 মিলিয়ন ডলার চায় যাতে ঐ শ্রমিকরা সময়মতন এ সম্বন্ধে সাবধান হতে পারেন। রেগন প্রশাসন, পাছে শ্রমিকরা শিল্পপতিদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করে এই ভয়ে ঐ অর্থ বন্ধ করে দেন।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকরা নির্লিপ্ত কেন

নোংরা রাজনীতির খেলায় কম যাননা বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক মহলও। ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট (NCI), আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি (ACS) এবং আরো কিছু ক্যানসার বিশেষজ্ঞের চাপে কংগ্রেস ক্যানসার বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দেয় তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক কর্তৃপক্ষ" কেই, এঁদের চাপেই '71 সালে "ক্যানসার আইন" চালু হয় যার ফলে 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ' জাত NCI একটি স্বশাসিত সংস্থায় পরিণত হয় এবং কার্য্যতঃ হয়ে পড়ে হোয়াইট হাউসের তাঁবেদার মাত্র। এইসব বিজ্ঞানীরা একযোগে তারস্বরে চিৎকার করে সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন যে ক্যানসার সেরে ওঠার ওষুধ হাতের প্রায় নাগালে এসে পৌছেছে, শুধুমাত্র আরো বেশ কিছু টাকা এবং সময় খরচ করলেই তা গাছ থেকে ছিঁড়ে টুপ করে হাতে এসে পড়বে। এবং 'কেমোথেরাপী' বা ওষুধ দিয়ে চিকিৎসাই ক্যানসার সারানোর সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। মাঝে মাঝেই এঁরা হৈ চৈ তোলেন কোন একটি আবিষ্কার নিয়ে যেমনটি তোলা হয়েছিল "ম্যাজিক ক্যানসার বুলেট" বা "ইণ্টার ফেরণ" নিয়ে—পরে দেখা গেল এর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বেশীর ভাগ তথ্যই কাঁপানো। এমনই এক "যুগান্তকারী" আবিষ্কার ইণ্টারলিউকিন--টু এর ক্ষেত্রেও দেখা গেল এর ক্ষমতা খুবই সীমিত, এবং এটি অত্যন্ত বিষাক্ত ওষুধ। তাছাড়া এতে চিকিৎসার খরচ ছাপিয়ে যেত ছয় অঙ্ককে, যা কিনা এঁরা লক্ষ্য করার দরকার মনে করেন নি। NCI এর ডিরেক্টর ডাঃ ভিনসেণ্ট ডেভিটা তো সরাসরি দোষ চাপালেন জনসাধারণের চিকিৎসকদের ঘাড়ে—ক্যানসার না সারার একমাত্র কারণ নাকি কম মাত্রায় 'কেমোথেরাপী' করা। NCI এবং ACS-এর ক্যানসারে "বেঁচে থাকার হার বাড়ছে" নামক দাবিও যথেষ্ট সন্দেহজনক। এই সব ফাঁপানো সংখ্যা হাজির করার সময় তাঁরা একবারও খেয়াল করেন না যে এখন ক্যানসার ধরা পড়ে তাড়াতাড়ি এবং রোগের তরুণ অবস্থাতেই, কাজেই রোগীদের বেঁচে থাকার সময়টা, চিকিৎসা না করলেও আপাতভাবে বেড়ে যাচ্ছে—কিন্তু কার্য্যতঃ তা একই; আর অনেকগুলি ক্ষেত্রে নির্দোষ টিউমারকেও সন্দেহের ভিত্তিতে ক্যানসারের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে যা কিনা এই হিসেবের মধ্যেই পড়ে।

এঁদের সম্মিলিত চাপে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের সিংহ ভাগই যাচ্ছে ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য গবেষণায়—লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেও যা দূর অস্ত, কিন্তু অবহেলিত হচ্ছে ক্যানসার প্রতিরোধের ব্যবস্থা।

যদি বা সামান্য কিছু অর্থ ক্যানসারের প্রতিরোধে খরচ হচ্ছে—তা ও যাচ্ছে—শিল্পপতিদের মনোমতন প্রচারে। এরা অবলম্বন করেছেন "আক্রান্তকে দোষ দাও" নীতি—অর্থাৎ ক্যানসারের মূল কারণ হিসেবে এঁরা প্রচার চালাচ্ছেন জীবনযাত্রার কিছু কু-অভ্যাস যথা ধূমপান (ফুসফুস) বেশী চর্বিযুক্ত খাবার (স্তন)-এর বিরুদ্ধে। ক্যানসার সৃষ্টকের বিরুদ্ধে এদের লড়াই-এর ঘোষিত লক্ষ্যের মধ্যে পেশাগত ও পরিবেশের ক্যানসার সৃষ্টকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ নেই। মজার কথা হলো উপরের কারণগুলো অত্যন্ত গুরুতর হলেও একমাত্র কারণ নয় একথা প্রমাণিত সত্য। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ফুসফুসের ক্যানসারের 20 শতাংশ হচ্ছে অধূমপায়ীদের এবং এই হার বাড়ছে, বাড়ছে এডিনো কারসিনোমার হারও যা ধূমপান সম্পর্কিত নয়—এক্ষেত্রে প্রধান কারণ বায়ু দূষন। 87-তে 90,000 জন নার্সের খাদ্যাভাস সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে চর্বিজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে স্তনের ক্যানসারের কোন সম্পর্ক নেই। এ সত্বেও এঁরা সেই ধূমপানের বিরুদ্ধে জয়ঢাক বাজিয়ে চলেছেন—যাতে মানুষের চোখ শিল্পজ রাসায়নিকের ওপরে না পড়ে। শুধু তাই নয় IARC (ইণ্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার)কে NCI চাপ দেয় যাতে এই ধরণের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব সম্বন্ধে তারা যেসব লেখা প্রকাশ করেছে তাতে বেনজিন ফরম্যালডিহাইড, কীটনাশক এলড্রিন/ডাই এলড্রিন ও ক্লোরডেন/হেপ্টাক্লোর, ট্রাইক্লোরোইথিলীন/পার ক্লোরো ইথিলীন প্রভৃতির ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতাকে কম করে দেখানো হয়।

প্রায় একদশক ধরে ACS এর সঙ্গে বিফল আলোচনার পরে জনস্বার্থ ও শ্রমিক স্বার্থে লড়াকু বিভিন্ন গোষ্ঠী সেণ্টার ফর সায়েন্স ইন দি পাবলিক ইণ্টারেস্ট-এর নেতৃত্বে এক 24 জন স্বাধীনমনা বৈজ্ঞানিকের সমর্থনে 1987 তে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ আনতে বাধ্য হয়। অভিযোগগুলি ছিল এরকম—(1) "জীবন থেকে ক্যানসার মুছে ফেলো" এরকম প্রতিজ্ঞা সত্বেও ACS পরিবেশ এবং পেশাগত ক্যানসার সৃষ্টকের উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে কোন সাহায্য করেনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে বাধা দিয়েছে। (2) ক্যানসারের কারণ হিসেবে আক্রান্তকেই দোষ দিচ্ছে। যেমন কালোদের মধ্যে ক্যানসার বেশী হবার কারণ হিসেবে ধূমপান ও খাদ্যাভাসকে দায়ী করছে কিন্তু এটা কখনোই বলছে না যে কালোদের থাকতে হয় সবচেয়ে দূষিত পরিবেশে, তাদেরকেই করতে হয় নোংরা ও বিপজ্জনক কাজ যা কিনা তাদের মধ্যে ক্যানসার বেশী হবার জন্যে দায়ী।

জনমতের চাপে ACS তার ঘোষিত নীতির পরিবর্তন ঘটায়। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এখন থেকে বেনজিন ও এসবেস্টস শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ আনার এবং দূষিত আবর্জনাকুণ্ড পরিস্কার করার জন্য চাপ দেবে, কিন্তু বাস্তবে তাদের হৃদয় পরিবর্তনের কোন লক্ষন নেই।

অ্যাকাডেমিশিয়ানরা পিছিয়ে নেই

শিল্পপতিদের মদত পুষ্ট তথাকথিত "অ্যাকাডেমিশিয়ান"রাও কম যান না। এঁরা নানান প্রকাশনার সাহায্যে জনসাধারণকে সচেতন করেন ক্যানসারের কারণ সম্বন্ধে 'অবশ্যই তার মধ্যে ধূমপানের ভূমিকা হয় অগ্রগণ্য আর শিল্পজ রাসায়নিকের ভূমিকা থাকে নগণ্য।' এঁদের মধ্যে আছেন অক্সফোর্ডের গ্রীন কলেজের ডিরেক্টর 'ডল' এবং সংখ্যাতত্ত্ববিদ

'পেটো' যাঁরা এরকম রিপোর্ট পেশ করেন যে ফুসফুস ছাড়া অন্য কোন অঙ্গের ক্যানসারের হার এখন আর বাড়ছে না—অবশ্যই এই রিপোর্টে তাঁরা কালোদের আর 65 বছরের বেশী বয়সীদের গণনা করতে ভুলে যান—যাঁদের মধ্যে ক্যানসারে মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশী। আগাছা নাশক 2, 4, D এবং 2,4, ST সম্বন্ধে অষ্ট্রেলিয়ায় যে কমিশন বসে তাতে সোৎসাহে তিনি শিল্পপতিদের পক্ষ নেন। এমিস নামে আর একজন জীনবিজ্ঞানী 70-এর দশকে ব্যাকটেরিয়ার জীনের পরিবর্তন দেখে (Mutation) অল্প সময়ে কোন পদার্থের ক্যানসার সৃষ্টির ক্ষমতা মাপার পরীক্ষা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অগ্নিনির্বাপক ট্রিস এবং ধূমোৎপাদক (funjent) ইথিলীন ডাই ব্রোমাইডের এর কুফল এবং ক্রমবর্ধমান ক্যানসারের হার সম্বন্ধে জনসাধারণকে সতর্ক করে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। 80-র দশকে কোন এক অজ্ঞাতকারণে তিনি ঠিক উল্টো গাইতে শুরু করেন—যথা ক্যানসারের হার আর বাড়ছে না, খাদ্যাভ্যাসই ক্যানসারের মূল কারণ, শিল্পজ রাসায়নিকের ভূমিকা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কাজেই এদের উপরে নিয়ন্ত্রণের তেমন দরকার নেই।

অন্য দিকে ঃ

আশার কথা এই যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সচেতন সাধারণ মানুষেরা, শ্রমিকসংঘগুলি এবং বেশ কিছু বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক বিভিন্ন জোটে আবদ্ধ হয়ে বা কখনো আলাদা ভাবে এদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন। প্রাদেশিক স্তরে বেশকিছু আইনও পাশ হয়েছে—যেমন ম্যাসাচুসেটস ও নিউইয়র্কে ক্লোরডেন/হেপটাক্লোর এবং এলড্রিন / ডাই-এলড্রিনের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, আপেল পাকানোর জন্য এলার এবং খাবারে ইথিলিন ডাইব্রোমাইড মেশানো বন্ধ করা, নিউজার্সির "কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে জানবার অধিকার" আইন। [বিশুদ্ধ বাতাস আইন-এর জন্যে লড়ছেন আমেরিকান হার্ট ও লাঙ এসোসিয়েশন, মার্চ অফ ডাইমস প্রভৃতি সংস্থা]

এরা আগামী দিনের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছেন, যথা—

1) ক্যানসারকে একটি প্রতিরোধযোগ্য অসুখ বলে গণ্য করতে হবে।

2) কি কি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না তা খুঁজে বার করতে হবে। জানতে হবে সরকারের এতে কী ভূমিকা আছে, শ্রমিক ও জনস্বার্থে যাঁরা লড়ছেন তাঁদের সহায়তা করতে হবে।

3) কংগ্রেসকে ক্যানসার প্রতিরোধের আইনগত বাধা দূর করতে হবে। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা যাতে পারস্পরিক সমন্বয়ে কাজ করতে পারে তা দেখতে হবে এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে এটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জাতীয় ক্যানসার আইন সংশোধন করে প্রতিরোধকে গুরুত্ব দিতে হবে।

4) শিল্পপতিদের মুনাফার দিকে লক্ষ্য না দিয়ে শ্রমিকের এবং জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে মনোযোগী হতে হবে। ভোগ্যপণ্য এবং কারখানায় ব্যবহৃত সবরকমের রাসায়নিকের গায়ে লেবেল লাগাতে হবে।

5) চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের আরো দায়িত্ববান হতে হবে। ACS এর কাজে ক্যানসারের চিকিৎসার গবেষণা ও প্রতিরোধ-এর চেষ্টার মধ্যে সমতা আনতে হবে।

6) নতুন আবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থের ক্যানসার সৃষ্টি করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক সমীক্ষা করতে হবে। জনগণের এই রিপোর্ট পরীক্ষা করার অধিকার থাকবে। যাঁরা এই তথ্য বিকৃতির চেষ্টা করবেন তাঁদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

7) ক্যানসার শুধুমাত্র বিজ্ঞানীদের বিবেচ্য বিষয় নয়। এর সমাধান হবে খোলা রাজনৈতিক মঞ্চে। কারণ প্রতিরোধ নির্ভর করে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাধানের উপরে। NCI-কে প্রেসিডেন্টের কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। ক্যানসার উপদেষ্টা বোর্ডকে ভেঙে শ্রমিক সংঘের বিভিন্ন জনস্বার্থরক্ষাকারী দলের প্রতিনিধি ও স্বাধীন বিজ্ঞানীদের নিয়ে নতুন করে গড়তে হবে। মুদ্রাস্ফীতির মতই এটিকে রাষ্ট্রের সমস্ত স্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

8) কোন কারখানার মালিক বা আমলারা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে তথ্য শ্রমিকদের কাছে গোপন করেন তবে তা White collar crime (অভিজাতদের অপরাধ) বলে গণ্য করতে হবে এবং এজন্যে কঠোর সাজা দিতে হবে। এই আইন প্রযোজ্য হবে তাদের উপরেও, যারা উন্নয়নশীল দেশের ক্রেতাদের না জানিয়ে নিজেদের দেশে নিষিদ্ধ রাসায়নিক বিক্রি করবেন।

জাতীয় স্তরে সত্যিকারের প্রাধান্য পেলে হয়ত একদিন ক্যানসারকে সত্যিই প্রকাশিত করা সম্ভব হবে।

[মূল রচনা স্যামুয়েল এস. এপস্টাইন-এর লেখা 'দ্যা পলিটিক্স অফ ক্যানসার'। প্রকাশিত হয়েছে 'মালটিন্যাশনাল মনিটার' পত্রিকার 6ই মার্চ, 1988 সংখ্যায় : সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ]।

—অমিতা

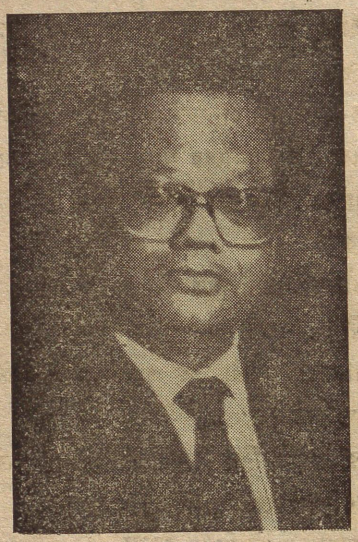

MESSAGE FROM DR ASHESH PROSAD MITRA, DIRECTOR GENERAL, CSIR

I am glad that EMR Division has arranged a get-together of the Editors/Publication-in-charges of languages journals being funded by CSIR, which are dedicated to the cause of popularisation of science through regional Indian languages. There are 20 journals in 9 languages receiving CSIR grants.

Majority of our population lives in rural areas and it is easier to communicate with them for popularisation of science in their mother tongue. As such, these journals play a role to present current scientific developments in India and abroad in simple and understandable language. They help to build proper temperament amongst literate laymen in the country, for making science more socially relevant and more concerned for human values. They serve as links between common man and the Science and Technology development, facilitate to extend relevant technologies developed in national laboratories/universities etc. to rural areas, help to improve the skills and reduce drudgery of the village artisans. Such journals may create awareness amongst the people to improve their health and hygiene and remove superstition.

I congratulate the Editors who have taken this difficult task to educate the common people, and rural population. CSIR on its part will continue to encourage such endeavours.

A P MITRA

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীর গ্রাহকদের প্রতি :

বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা বারো টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকা ডাকে পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। সেক্ষেত্রে ডাক মাশুল সহ গ্রাহক চাঁদা পনেরো টাকা। "বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী"—এই নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে নাম-ঠিকানার স্পষ্ট উল্লেখ প্রয়োজন।

প্রযত্নে ঃ অভিজিৎ লাহিড়ী ☐ B2 বৈশাখী ☐ 153/1 যশোহর রোড, কলিকাতা 700074 (ফোন 59-7357)

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। পুরোনো গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, যাঁরা এখনও তাঁদের গ্রাহক চাঁদা আমাদের কাছে পাঠাননি—যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

পড়ে দেখুন

উৎস মানুষ ; গণবিজ্ঞান সমন্বয় বুলেটিন ; বিশ্লেষণ ; বিজ্ঞান মঞ্চ বুলেটিন ; বিজ্ঞান দিশারী ; গণস্বাস্থ্য ;

এবার যাঁরা কাজ করেছেন ঃ

কম্পোজ– গীতশ্রী সেন, গোপাল ঘোষ, দুলাল বোস, স্বপন সেন, কালীপদ নস্কর।

মেক্‌আপ—স্বপন সেন

মেশিনম্যান—শক্তি, স্বপন

বাইণ্ডিং—লক্ষণ দাস

মুদ্রক—পূর্ণেন্দু বিশ্বাস

বি ও বি-র টিম – সত্যব্রত, স্বাতী, শান্তনু, শেখর, অসীম, রবীন, ।

R. N. 34929/79
YEAR 14, NUMBER 2

A bi-monthly magazine
VIGYAN-O-VIGYANKARMI
C/o A. Lahiri
B2 Baisakhi, 153/1 Jessore Road, 700074
September-October, 1990

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষ্যে :
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা আয়োজিত বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা

প্রকৃতি ও মানুষ ঃ—শিশু ও দৃষ্টিহীনদের অভিজ্ঞতা

কপিলানন্দ মণ্ডল ও তাঁর সহকর্মীরা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গ্রামীণ শিশুদের নিয়ে "বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান" গড়ে তোলার দীর্ঘ বছরের অভিজ্ঞতার কথা বলবেন।
হেনা বসু স্লাইড সহযোগে বলবেন "ওয়ার্কশপ ফর দ্য ব্লাইড" এর দৃষ্টিহীনদের নিয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষা শিবিরের অভিজ্ঞতা।

স্থান—অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি হল, রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ
তারিখ ও সময়—27শে এপ্রিল, শনিবার বিকেল 2-30 মিনিট

আপনি আসুন, বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আসুন।

সহযোগিতা—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে 130 কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-700009 থেকে প্রকাশিত।